তিনিই আমার রব

শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি

চতুর্থ খণ্ড

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

শাইখ আলি জাবির আল ফাইফি। পুরো নাম আলি ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি জাবির আল ফাইফি। ক্ষুরধার এক লেখনীশক্তি নিয়ে ইসলামি সাহিত্যজগতে এই মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছে। তার ব্যাপক জনপ্রিয় দুটি বই 'লিআল্লাকাল্লাহ' এবং 'আর রাজুলুন নাবিল' সমকালীন প্রকাশন থেকে যথাক্রমে 'তিনিই আমার রব' এবং 'তিনিই আমার প্রাণের নবি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই বই দুটোই তাকে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে আনে। লেখকের আরও একটি অসাধারণ সাহিত্যকর্ম 'ইউসুফিয়্যাত' যা বাংলায় ভাষায় 'ইউসুফ ﷺ এর ঘটনাবহুল জীবন এবং আমাদের জন্য রেখে যাওয়া শিক্ষা' নামে অনূদিত হলো। লেখক বর্তমানে সাউদি আরবের একটি খ্যাতনামা কলেজে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত। পাশাপাশি তিনি বিখ্যাত কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি করছেন।

সমকালীন প্রকাশন

بسم الله الرحمن الرحيم

তিনিই আমার রব

(চতুর্থ খন্ড)

শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি

তিনিই আমার রব

(চতুর্থ খন্ড)

সমকালীন প্রকাশন

৬ বছর বয়সে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। তারপর বাবাকে সেটা জানাই। স্বপ্নের বিবরণ শুনে বাবা মুচকি হাসি দিয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, তা আমার আজও মনে আছে! কয়েক বছর পর আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেলাম, আমি আল্লাহকে নিয়ে একটি বই লিখব!

আমার বাবার জন্য এ বইটি নজরানা হিসেবে পেশ করছি...

প্রকাশকের অনুভূতি

সকল প্রশংসা ও স্তুতি কেবলই মহান আল্লাহর জন্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর সীমাহীন নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে থাকি সর্বদা। মানবজাতির কল্যাণে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল পৃথিবী, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, গগণচুম্বী পর্বতমালা, রং-বেরঙের ফুলফল, গাছপালা-সহ অসংখ্য মাখলুক। আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও করুণা কখনো পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন রহমত হিসেবে। তার অনন্য গুণাবলি ও চারিত্রিক মাধুর্য সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি মহান রবের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার বহু গুণবাচক নাম রয়েছে। পবিত্র, সুন্দর ও শাশ্বত এই নামগুলোকে বলা হয় আসমাউল হুসনা। এসব নামের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে নতুন করে চিনতে পারি, তাঁর মহান সত্তাকে বিভিন্ন রূপে অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি। এসব নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ক্ষমতা, অনুগ্রহ, অমুখাপেক্ষিতা, সৃজনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাই আসমাউল হুসনা জানার মাধ্যমে আমরা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারব। পাপে ভরা জীবন ছেড়ে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে দেখতে কেটে গেল ৫টি বছর। ৫ বছর আগে সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'তিনিই আমার রব' সিরিজের ১ম খণ্ড। এরপর

একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডদুটিও আলোর মুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া, এই সিরিজের প্রতিটি বই পাঠকমহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এবার নিয়ে এলাম ৪র্থ খণ্ডটি।

১ম খণ্ড ও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক আরবের বিখ্যাত শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি। বাকি গ্রন্থদুটির রচয়িতা সিরিয়ান শাইখ ড. রাবিত আন-নাবুলুসি। যেহেতু পৃথক-পৃথকভাবে তারা এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই ২য় ও ৩য় খণ্ডের বর্ণিত হওয়া আল্লাহ তাআলার ৩টি নাম পুনরায় আলোচিত হয়েছে এখানে। নামগুলো হচ্ছে আল-ওয়াহহাব, আল-হক ও আল-বাদি। উল্লেখ্য, অধ্যায়ের নাম এক হলেও আলোচনার বিষয়বস্তু, লিখনশৈলী, বিবরণভঙ্গি, উদাহরণ, উপমা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আমরা এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারি, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রতিটি লেখা পাঠকদেরকে আল্লাহর সাথে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে, তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্বকে আরও চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলবে। আশা করি, বাকি বইগুলোর মতো এ বইটিও সকল শ্রেণির সকল বয়সের মানুষদের জন্য অফুরান কল্যাণ বয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বিনীত আর্জি, ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টার অসিলায় আপনি আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। সেই সাথে এই বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কাল হাশরের ময়দানে আপনার আরশের নিচে আশ্রয় লাভের সুযোগ করে দিন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

লেখকের অনুভূতি

আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার তরে, যে পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনি সন্তুষ্ট হলেও প্রশংসা আপনার তরে। আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও আপনার জন্য সকল প্রশংসা। আমরা যে আপনার প্রশংসা করতে পারছি, সে জন্যও প্রশংসা।

দরুদ ও সালাম আমাদের ইমাম, নেতা ও আদর্শ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর প্রতি। তার পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি আর আখিরাত পর্যন্ত তার আদর্শের অনুসারীদের প্রতি।

৬ বছর আগে প্রকাশিত *লি-আন্নাকাল্লাহ* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড এটি। একই ধারাবাহিকতা ও বিন্যাস বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। যাতে বই দুটি গঠনে ও বিষয়বস্তুতে মিলে যায়। আল্লাহর কাছে চাইব, তিনি যেন প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেরও গ্রহণযোগ্যতা লিখে দেন, আর এই বইয়ের বরকত লেখক, পাঠক এবং তাদের মা-বাবার জীবনে চিরন্তন সন্তুষ্টি ও তাওফিক প্রদানের মাধ্যম করে দেন।

আপনার সামনে বইয়ের যে দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থাপন করছি, আমি আল্লাহর কাছে চাইছি তিনি যেন এটাকে হৃদয়ের জন্য উপকারী করে দেন এবং আল্লাহর দিকে যাত্রা করার ক্ষেত্রে মানুষের হিম্মতকে জাগ্রত করার উপকরণ করে দেন। প্রথম খণ্ডে যেভাবে সাজিয়েছিলাম, এটাকেও সেভাবে সাজিয়েছি। এটা এমন কোনো ইলমি বই না যেখানে সংজ্ঞা, প্রকার, মতামত উপস্থাপন করে বিপরীত মতের খণ্ডন করা হয়। এটা এক সাহিত্যিকের কলম, যদি আমি বাস্তবে সাহিত্যিক হয়ে থাকি। এক ভাবুকের কলম, যদি আমি ভাবুক হওয়ার উপযুক্ত হয়ে থাকি। সকল মুসলিমের মতো আমিও আল্লাহকে ভালোবাসি। আল্লাহ ভালোবাসা, ইবাদত ও তাকওয়া পাওয়ার উপযুক্ত। রবের ভালোবাসা থেকেই আমি কিছু লেখার ইচ্ছা

পোষণ করলাম। যদি এতে কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে এক আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে, তাহলে যে হৃদয় তাকে ভালোবাসে, তাকে তিনি যেন শাস্তি না দেন সেজন্য তাঁর কাছেই আমি সাহায্য চাইব! তাঁর কাছেই আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করব।

আমার জবান তোমার স্তুতির উপযুক্ত নয়

হৃদয়ের সবটুকুজুড়ে তাই তোমার সিজদার স্থান।

আল্লাহর কাছে চাই, যারা এ বই ভালোবাসে, পড়ে, লেখকের জন্য দুআ করে, বইটি প্রচার-প্রসার করে, বইকে কেন্দ্র করে পাঠের প্রকল্প দাঁড় করায়, মাদরাসায় ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, তাদেরকে যেন তিনি উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর সবাইকে যেন তিনি বরকত দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের বাবা-মাকে আর সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আলি ইবনু জাবির আল-ফাইফি

পহেলা সফর, ১৪৪৪ হিজরি

অনুবাদকের অনুভূতি

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। পৃথিবীতে আসার সময় আল্লাহকে বলিনি, 'আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাকে মুসলিম হিসেবে পাঠাবেন।' কিন্তু তিনি আমাকে মুসলিম হিসেবে পাঠিয়েছেন। শুধু এই একটা নিয়ামতের জন্যই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। তাই যত দিন হায়াত আছে, হৃদয়ের গভীর থেকে বলে যাব, 'আলহামদুলিল্লাহি আলা নি'মাতিল ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম নামক নিয়ামতের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই!'

পৃথিবীতে আসার আগে ও পরে যে পরম মমতা ও করুণায় তিনি আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখেন, তা কোনোভাবেই ভোলা যাবে না। ভুলে গেলে তা হবে নাফরমানি! সুস্থ শরীর ও মস্তিষ্ক—এই বিশেষ নিয়ামতের জন্য আবারও মহান রবের কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করার কারণ—এই বইটি আল্লাহকে নিয়েই। আল্লাহর অগণিত নামের মাঝে বাছাইকৃত কিছু নামের অর্থ, তাৎপর্য এবং সেগুলোর মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা ও গূঢ় রহস্যই এই বইয়ের প্রতিপাদ্য।

আল্লাহর সাথে যখন আমাদের সম্পর্কটা কল্পনা করি, তখন এভাবে চিন্তা করি—আমরা কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, কত দুর্বল ও অসহায়! আর আল্লাহ কত মহান, কত বড়, কত শক্তিমান ও পরাক্রমশালী! একটি উদাহরণ দিই। মনে করুন, একটা বিস্তীর্ণ ময়দানে যদি একটি আংটি ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে কি সেটি খুঁজে পাওয়া যাবে? মনে হবে কত সামান্য একটি আংটি। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর হয়তো চোখে পড়বে। আল্লাহ তাআলা যে আরশের ওপর আছেন, সেটার তুলনায় আল্লাহর কুরসি ঠিক এতটাই ক্ষুদ্র। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন, আরশের মধ্যে কুরসির অবস্থান ঠিক সেরকম, যেমন ভূপৃষ্ঠের কোনো উন্মুক্ত

ময়দানে পড়ে থাকা একটি আংটি।[১] আর সেই আংটিতুল্য কুরসি থেকে ৫০০ বছরের দূরত্বে রয়েছে পানি। আর পানির ওপর রয়েছে আরশ। সুবহানা রাব্বি![২]

তাই মহান রব সম্পর্কে আমরা যতই জানতে থাকি, আমাদের জানার কোনো শেষ হয় না। কথাটি হয়তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা যখন আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবব, জীবনের সাথে জড়িয়ে দেখব, আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব বোঝার চেষ্টা করব, তখন আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। বুঝতে পারব, আল্লাহকে জানার কোনো শেষ নেই!

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেছিলেন, 'সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সর্বোচ্চের (আল্লাহর) ব্যাপারে জ্ঞান।'[৩]

পার্থিব জীবনে আমরা বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি। কখনো জীবিকার তাগিদে, কখনো জানার নেশায়। আমাদের অর্জিত জ্ঞানসমূহে কিছু উপকারী বিষয় থাকে, কিছু জ্ঞানে উপকার বা ক্ষতি কিছুই থাকে না, আর কিছু জ্ঞানে থাকে ক্ষতিকর বিষয়। এত কিছুর ভিড়ে আমাদের পার্থিব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। আমরা দুনিয়ায় যত জ্ঞানই অর্জন করি না কেন, সবই আল্লাহকে জানার তুলনায় যৎসামান্য। আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য তো কেবল আল্লাহকে জানা। এখান থেকেই আমাদের জ্ঞানযাত্রার সূচনা।

২০১৮ সালের কথা। আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি হাফিযাহুল্লাহ রচিত *লি-আল্লাকাল্লাহ* বইটির অনুবাদ করি। বইটিতে আল্লাহর দশটি নাম, সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও শিক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে চমৎকার আলোচনা ছিল। নামগুলো নিয়ে লেখকের গভীর অনুধাবন ও সুন্দর কথামালা আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেল। লেখক বইটির পরবর্তী খণ্ড রচনা করলেন। আগের বইটি অনুবাদ করে বেশ সাড়া পেয়েছিলাম। বইটি যে আসলেই মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে জানতে আগ্রহী করে, তার প্রমাণ মিলেছিল। ফলে এই বইটিও অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই।

চরম সত্য এটাই—আমাদের জীবনটা উদাসীনতা আর গাফেলতি দিয়ে ভরপুর।

---

[১] *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩৯; *আল-উলু*, যাহাবি, পৃষ্ঠা : ১৫০; শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[২] *আল-আরশ*, যাহাবি, পৃষ্ঠা : ১০৫; বর্ণনাটি সহিহ।

[৩] *জামিউল মাসাইল*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৮

দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে যতটুকু সময় আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত, তার সিকিভাগও আমরা করতে পারি না। পার্থিব চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকি সবসময়। এসব ব্যস্ততা ও উদাসীনতার মাঝেও কোনো পাঠক যদি এই বইটি পড়তে শুরু করে, তাহলে এটি তার চিন্তায় রেখাপাত করবে। কারণ এ বইয়েও লেখক আল্লাহর সুন্দরতম আরও ১১টি নাম বাছাই করেছেন। আল্লাহর যে পরিচয় আমরা জেনেও ভুলে যাই আর যা সামনে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় স্মরণিকার প্রয়োজন পড়ে, লেখক সেসব বিষয় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা পাঠকমনকে আল্লাহমুখী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, হে আল্লাহ! আপনার দ্বীনের খেদমত করার জন্য যতটুকু ইলমি ও আমলি যোগ্যতা দরকার ছিল, এ অধমের তা হয়তো সামান্যই আছে। তবু আপনি দয়া করে সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমার সামান্য কাজটুকু কবুল করে নিন। এই বইটির কাজে জড়িত লেখক-অনুবাদক-সম্পাদক-প্রকাশক সকলের ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন!

আব্দুল্লাহ মজুমদার

২৪ জুমাদাল উলা, ১৪৪৫ হিজরি

সূচিপত্র

আর-রহমান	**২১**
গুহার ভেতর আলোর দেখা	২১
রহমতের চাদর	২৩
অনুভূতির প্লাবন	২৪
বিজ্ঞদের থেকে জেনে নাও	২৫
রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি	২৬
মৃত্যু একটি নিয়ামত	২৮
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন	২৯
আল-জামিল	**৩১**
সুবহানাল্লাহ	৩১
বিস্ময়কর ঝুড়ি	৩২
কমলা আর ডালিম	৩৩
প্রজাপতি	৩৪
সকাল বেলার সুমধুর সুর	৩৫
নাস্তিকরা আসলেই বোকা!	৩৬

আল-ওয়াহহাব ৩৮
তিনি ওয়াহহাব ৩৮
অফুরান সম্পদ বনাম আপনার দুটি চোখ ৪০
পাপকাজের ইতি টানুন ৪১
বরকতময় ব্যর্থতা ৪২
ছাদ-বিহীন দুআ ৪৩
আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম ৪৭
সর্বাধিক দানশীল তিনি ৪৯

আল-হক ৫১
সুস্পষ্ট সত্য ৫১
লক্ষ্য করো ৫১
রাতের বেলায় ৫৪
তুমি নিশ্চয় জানো ৫৫
প্রকৃতি! প্রকৃতি! ৫৬

আল-হাকিম ৫৮
তোমাদের আপন সত্তায় ৫৮
আয়না ৫৯
তাঁর হুকুম ৬১
দুই নারীর সমান অংশ ৬২
স্রষ্টার প্রজ্ঞা ৬৩
আমাকে জানান ৬৪
যথাযথ অনুপাতে ৬৬
আলঝেইমার ৬৭

আল-আলিম ৭১
তিনি অবশ্যই শুনলেন ৭২

তিনি সেটা জানেন ৭৩
তিনি তা জানেন... ৭৩
তিনি তা জানেন... ৭৪
সালাফ ৭৪
সহজ ৭৬
ইবনু কাসিরের ইতিহাসগ্রন্থ ৭৭
প্রশান্তি আছে ৭৮
ভয়ও আছে ৮০
সমুদ্রের গহ্বর ৮১
চেনা মানুষ ৮৩

আল-ফাত্তাহ ৮৭

সুসংবাদ ৮৭
জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন ৮৯
দুআর দ্বার উন্মোচন ৯০
নববির কান্না ৯২
বিস্ময়কর উন্মোচন ৯২
উন্মোচনকারীর দান ৯৫

আল-কাদির ৯৭

যে পানি গড়িয়ে পড়ে না ৯৭
বিস্ময়কর এ পৃথিবী ৯৯
আর্তচিৎকার ১০০
বর্ষণশীল বারিধারা ১০০
চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে ১০১
সমূলে উৎপাটিত ১০২
অসম্ভবের চাইতেও বেশি ১০৪

যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা করে ১০৫

আল-ওয়ালি ১০৮

ধূলিকণা ১০৯

যুদ্ধের সূচনা ১১০

তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন ১১১

হৃৎকম্পন ১১২

সুরক্ষিত ঢাল ১১২

এতিম হয়েও আলিম ১১৩

তাকে আপনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে দিন ১১৪

নেককারদের অভিভাবকত্ব করেন ১১৫

আল-ক্বওয়ি ১১৮

আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই ১১৯

বিশাল বাতি ১২০

আমি অসুস্থ ১২১

অহংকারীদের তিনি অবদমিত করেন ১২২

ডোজ ১২৩

বিশাল পর্বতমালা ১২৪

মশা ১২৫

তাঁবুগুলোর মাঝে ১২৭

সে মারা গেল! ১২৮

যখন হৃৎপিণ্ড থেমে যায় ১২৯

আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কুফরি করল ১৩০

...কিন্তু তাদের সীমালঙ্ঘন বাধাহীন! ১৩০

ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু ১৩১

আল-বাদি ১৩৩
আওয়াজ : এক বিস্ময় ১৩৪
জীবনের সুর ১৩৪
গোপন, আর গোপনই থাকবে ১৩৫
মোরগের ডাক! ১৩৬
চোখ ১৩৭
রং ১৩৮
গ্লাস ১৪০
আম্বর ১৪২
মুক্তো ১৪৩
মুগ্ধতার ভিড়ে ১৪৪
তোমাদের নিজেদের মাঝেই ১৪৫
সূর্য ১৪৬
অক্সিজেন ১৪৮
উপসংহার ১৪৯

আর-রহমান

আমি আল্লাহর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি রহমান-রহিম। আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়ালু না হতেন, তাহলে কেমন হতো এ জীবনটা? আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারি, চোখ দিয়ে প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পারি, কান দিয়ে শব্দ শুনতে পাই। এ সবকিছুতেই আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও রহমতের প্রকাশ ঘটে।

আমি আল্লাহর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ এই নামটা মুসলিমের জীবনে গভীরভাবে প্রকাশ পায়। আল্লাহ আমাদেরকে সকল কাজ শুরু করতে বলেছেন 'রহমান-রহিম' নাম দিয়ে যেন আমরা রহমত, বরকত আর তাওফিক পেতে পারি।

সালাতের প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে রহমান-রহিম নাম আসে। এর মাধ্যমে সর্বোত্তম আমলের সুন্দরতম সূচনা হয়!

কুরআনের প্রতিটি সুরার শুরুতে রহমত শব্দটি এসে শুভ উপস্থাপনা হয়!

কুরআনের ১৬০টিরও বেশি আয়াতে এই নামটি দেখা যায়। এমনকি কুরআনে অভিনব বাক্যশৈলী দিয়ে সাজানো হয়েছে পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা 'আর-রহমান'।

'রহমান-রহিম' নামের সাহায্যে আমরা আমাদের আত্মা নিয়ে রহমতের আসমানে উড়াল দিই।

গুহার ভেতর আলোর দেখা

গুহাবাসীর ঘটনায় আছে, তারা এমন একদল যুবক, যারা নিজেদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল। তাদের সম্প্রদায় আল্লাহর সাথে শির্ক করেছিল। তারা সে সম্প্রদায়

থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রশস্ত জীবন থেকে পালিয়ে তারা ঢুকে পড়েছিল এক সংকীর্ণ গুহায়!

অন্ধকার, শীতল এক গুহা। যে গুহায় নেই আয়েশি জীবনের কোনো উপকরণ।

এমন গুহায় জীবন কেমন হবে? বছরের পর বছর শীতে যে গুহা স্ট্যালাকটাইটের চুনে ভরে গেছে, সেখানে তাদের রাতগুলো কেমন হওয়ার কথা? নিশ্চয় তাদের জীবনটা ছিল ভূতুড়ে, রাতগুলো ছিল শীতল, ধীর ও একাকী!

কিন্তু গুহার বিবরণ দিয়ে কুরআনে যে আয়াত আছে, সেটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে তাদের গুহা আলোকিত ছিল। কীভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ সেই গুহার দেওয়ালে অদৃশ্য আলো ছোট ছোট বাতির মতো জ্বেলে গুহাটি আলোকিত রেখেছিল। আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল সেই গুহার সবচেয়ে দামি আসবাব যার বদৌলতে গুহাটি হয়ে পড়ে দুনিয়ার তাবৎ প্রাসাদের মাঝে সবচেয়ে দামি! এই আসবাব হলো রহমত! আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ... ﴿١٦﴾

তোমরা যেহেতু তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে, তাদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, সেহেতু তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তৃত করবেন।[১]

রহমান যখন কোনো অন্ধকার জায়গায় আলো ছড়িয়ে দেন, সে জায়গাটা তিনি উজ্জ্বল করে দেন। সংকীর্ণ গুহায় তিনি রহমত ছড়িয়ে দিলে সেটা প্রশস্ত হয়ে যায়। মৃত প্রাণে তিনি রহমত দিলে সেটা সজীব হয়ে ওঠে।

এই এক রহমতের কারণে ৩০০ বছর ধরে তাদের কোনো খাবারের প্রয়োজন পড়েনি! তারা পূর্ণ বিশ্রামে ছিল, আরামের ঘুম বহু বছরেও ভাঙেনি। দুঃখ তাদের গুহায় উঁকি দিতে পারেনি। দুশ্চিন্তা তাদের হৃদয়ে ঠাঁই পায়নি। ভয় তাদের গুহার কাছেই আসতে পারেনি। বরং ভয়ই পিছু হটেছে! আল্লাহ যদি আপনাকে বিশেষভাবে তাঁর কোনো একটা দয়া বা অনুগ্রহ দান করেন, তাহলে আপনার জীবনের সকল

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ১৬

দুঃখ-দুশ্চিন্তা মোকাবেলার জন্য সেটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে!

সংকীর্ণ গুহায় আল্লাহর ছড়িয়ে দেওয়া এই অনুগ্রহের বরকতে তাদের গুহার ঘটনা আজ হয়ে পড়েছে এমন বিবরণ, যেটা সকল মুসলিম প্রতি সপ্তাহে পড়ে। এর থেকে তারা আলো গ্রহণ করে। রবের ওপর ঈমান আনা এই যুবকদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আরও বেশি ধাবিত করে।

রহমতের চাদর

আল্লাহর অপরিসীম রহমতের প্রমাণ হলো, তিনি জানেন জাহান্নামের আগুনে শরীর ও আত্মা কেমন কষ্ট আর যন্ত্রণা পাবে। তিনি জানেন কোন কোন বিষয়গুলো ঐ জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। তাই তিনি বান্দাদের ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেন যেখানে সব ধরনের দলিল দিয়ে বোঝা যায় আল্লাহই এই কিতাবে থাকা কথাগুলো বলেছেন। কুরআনে তিনি নার, জাহান্নাম, সাইর, হুতামা, লাযা, হাবিয়াসহ জাহান্নামের আরও বহু নাম শত শত বার এনেছেন। জাহান্নামে নিয়ে যায় এমন কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কোন কাজ করলে জাহান্নামে ব্যক্তি চিরস্থায়ী হয় তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ সবই বান্দাদের প্রতি দয়ার কারণে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য।

কুরআন-সুন্নাহর নানান বক্তব্যে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন, তিনি ক্ষমাশীল, যাতে বান্দারা সবকিছু ছেড়ে তাঁর দিকে ফিরে যায়। তিনি আরও জানান, বান্দার তওবায় তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তাদেরকে দেওয়া নিয়ামতের কথা বলে তাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাদেরকে সবচেয়ে অভিনব সৃষ্টি, সুন্দর বণ্টন, চূড়ান্ত সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে তারা তাঁর নেককার বান্দাদের মাঝে শামিল হওয়ার তীব্র আগ্রহ পোষণ করে।

তিনি বান্দাদের প্রতি রহম করেন। তিনি চান তারা জান্নাতে প্রবেশ করুক। তাই তাদের কাছে জান্নাতের গাছপালা, সুমিষ্ট পানীয়, সুরম্য প্রাসাদ, অনন্য কক্ষ আর সুখী জীবনের বর্ণনা দেন। তাদের কাছে বারবার এগুলো বলেন। চিরস্থায়ী নিবাসের প্রতি আগ্রহ তীব্র করে তোলে এমন আয়াতগুলো বারবার বলেন। কোনো আয়াতে যদি তারা উদাসীন থাকে, দ্বিতীয় একটি আয়াত এসে তাদের জাগ্রত করে তোলে। দ্বিতীয় আয়াতেও উদাসীন থাকলে অন্তত তৃতীয় আয়াতে আর উদাসীন থাকে না। এভাবে নরম ভাষায়, উন্নত ভাষাশৈলীতে, নানান বিবরণে তিনি জান্নাতকে ফুটিয়ে তোলেন। কুরআন পাঠক যদি জান্নাতের সবুজ বাগান দেখতে না-ও পায়, তবু নদীর সৌন্দর্য হয়তো তার ভালো লেগে যাবে। যদি কুরআন পাঠক জান্নাতের প্রাসাদ কল্পনা করতে না পারে, তাহলে তার কল্পনায় হুরের ভাবনা অন্তত আসবে।

আল্লাহ খারাপ কাজগুলোর কথা কুরআনে ব্যক্ত করে সেগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে বান্দাদের কাছে ঘৃণিত করে তোলেন যাতে বান্দারা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে, বান্দারা যেন আল্লাহর ক্রোধ আর অসন্তোষ থেকে বিরত থাকে।

ভালো কাজগুলো তিনি সুন্দর গুণাবলিতে ভূষিত করে উন্নত মানের ভাষায় তুলে ধরেন। মানুষের মন সেই ভালো কাজগুলো করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ যে কাজগুলো করার তাওফিক তাকে দেন, সেগুলো করার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এভাবে আল্লাহর কাছে বান্দাদের মান-মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। কতই না মহান সেই সত্তা, যিনি রহমান-রহিম।

অনুভূতির প্লাবন

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর রহমতের ১০০ ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ১ ভাগ তিনি জিন, মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্ট জীব একে অপরকে ভালোবাসে এবং অনুগ্রহ করে। এই এক ভাগ রহমতের মাধ্যমে বন্য পশু তার সন্তানের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ তাঁর ১০০ ভাগ রহমতের ৯৯ ভাগ রহমত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন নিজ বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন।'[১]

সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন হলো, তিনি বাবা-মায়ের অন্তরে সন্তানদের প্রতি এমন অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেটা না থাকলে তাদের জীবন চলত না। এই অনুভূতিকে কোনো সৃষ্টজীব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। একজন মাকে যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ দিয়ে বলা হয় তার সন্তানকে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলার জন্য, তাহলে মা কখনোই সেটা করতে পারবে না। বাবাকে যদি বলা হয় তার সন্তানকে একটা চলন্ত গাড়ির সামনে নিক্ষেপ করতে, এর বদলে তাকে কারুনের মতো অর্থসম্পদ দেওয়া হবে, তবুও বাবা সেই জঘন্য কাজটি করতে পারবে না! কী সেই অনুভূতি যা এমন সব লোভনীয় অফারকে থামিয়ে দেয়? এমন আকর্ষণীয় সব প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়?

নাস্তিকতা কীভাবে এমন অনুভূতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারল? কোনো নাস্তিকের জন্য তার হৃদয়ের গভীরে থাকা এমন অনুভূতি অস্বীকার করা সম্ভব নয়!

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৭৫২

এই অনুভূতির জন্য নির্ধারিত কোষের নামটা কী? বাবার হৃদয়ে দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে যে এনজাইম, সেটার নাম কী? মায়ের শরীরের কোন হরমোনগুলো এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে?

কোনো নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন, কেন বিড়ালের বাচ্চার কাছে কেউ এলে বিড়ালটির মা হিংস্র প্রাণীর রূপ নেয়? ডারউইনবাদীরা এই অনুভূতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? এটা যদি তার স্বভাব বা প্রকৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এমন প্রকৃতি তাকে কে দিলো?

মূলত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি নেমে আসা অনুগ্রহ যাতে বান্দারা একে অপরের প্রতি দয়া-মমতা প্রদর্শন করে। কোনো বস্তুবাদ এই দয়ার অনুভূতির স্থান নির্ণয় করতে পারবে না। কোনো পরীক্ষাগার এই অনুগ্রহের মাত্রা পরিমাপ করতে পারবে না। কোনো মাইক্রোস্কোপ এই অনুভূতির প্লাবনের ছোট ছোট পরমাণু কোনোদিনও দেখাতে পারবে না।

বিজ্ঞদের থেকে জেনে নাও

'রহমান-রহিম' এই দুই নামের মর্যাদা এমনই যে আল্লাহ এগুলোকে কুরআন পাঠের সময় 'বিসমিল্লাহ'র সাথে জুড়ে দিয়েছেন। একজন মুসলিম কুরআন কারিমের যে কোনো সুরা পড়ার আগে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' পড়ে। দিন-রাতে প্রতিটি কাজে একজন মুসলিম বিসমিল্লাহ বারবার বলে। যেন আমাদের এ জীবনে আমরা যত কল্যাণ অর্জন করি, সব এই নামের বদৌলতেই পাই। আমাদের জীবনে আমরা যত অনিষ্টকে ভয় পাই, সেগুলো এই নামের মাধ্যমেই প্রতিহত করি। আল্লাহর এই নামটা ছাড়া জীবন চলত না। এই নামবিহীন জীবনের কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই তো বারবার বিসমিল্লাহ বলা গুরুত্বপূর্ণ। বারবার এই নাম বলতে বলতে এক পর্যায়ে মুমিনের হৃদয়ে তার রবের অনুগ্রহের প্রতি গভীর অনুভূতি তৈরি হয়।

এই নাম ও গুণের মর্যাদা এত বেশি যে, আল্লাহ যখন আরশের ওপর সমুন্নত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, তখন এই নামটা কুরআনে দুইবার এনেছেন। একবার বলেছেন—

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

রহমান আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।[১]

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৫

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

তারপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। (তিনি) রহমান, সুতরাং তাঁর ব্যাপারে যিনি সম্যক অবহিত, তাকেই জিজ্ঞেস করো।[১]

মহান আরশকে অনুভব করা, সেই আরশের ওপর প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টা বুঝতে গেলে জীবিত হৃদয়ে তীব্র ভয়, আশঙ্কা ও ভক্তির অনুভূতি স্পর্শ করে যায়। তাই তো আল্লাহ এই প্রসঙ্গে নামটা এনেছেন, যার থেকে রহমত ও বরকতের আলোকচ্ছটা প্রবাহিত হয়ে মুত্তাকি বান্দাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে। আরশের ওপর সমুন্নত হয়ে আল্লাহ বান্দাদের গোপনীয় বিষয়গুলো দেখছেন, তারা কি প্রকাশ করছে আর কি গোপন রাখছে, সেটাও আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন—এটা বুঝতে পারলে বান্দারা ভীত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি রহমান। তিনি আপনার গুনাহ জানার পরও সেটা ক্ষমা করা পছন্দ করেন। তিনি আপনার সীমালঙ্ঘন শোনার পরও তওবা করা পছন্দ করেন। তিনি আপনাকে ভুল করতে দেখলেও ফিরে আসাটা পছন্দ করেন। তিনি হলেন রহমান, যার সহিষ্ণুতা জানাকে ছাড়িয়ে যায়, যার অনুগ্রহ অসন্তুষ্টিকে ছাড়িয়ে যায়, যার ক্ষমা প্রতিশোধকে ছাড়িয়ে যায়।

'তাঁর ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো' আয়াতটিতে একটু মনোযোগ দিন। আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আপনি তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তাঁর ব্যাপারে নিজের জ্ঞানের মাত্রা বাড়িয়ে নেন। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করুন, যিনি তাঁর ব্যাপারে জানেন। তারপর তাঁর অনুসরণ করুন।'[২] এটা তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের প্রকাশ। তিনি জানার বিষয়টা কেবল বান্দাদের হৃদয়ে তাঁকে জানার স্বভাবজাত আগ্রহের মাঝে সীমিত করে দেননি বরং জানার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে করে তাকে জানার মাধ্যমে বান্দাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি ও হিদায়াত অর্জিত হয়।

রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি

সুরা মারইয়ামে শাস্তির স্থানে রহমানের নাম এসেছে—

---

[১] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৫৯

[২] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৯

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

হে আমার বাবা, আমি আশঙ্কা করি আপনাকে রহমানের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি স্পর্শ করবে।[১]

আগে যখনই আমি এ আয়াতটি পড়তাম, আপন মনে প্রশ্ন করতাম, এখানে কেন বলা হয়নি, প্রবল ক্ষমতাধরের পক্ষ থেকে শাস্তি? কারণ, আমার মনে হতো, শাস্তি দেওয়ার কাজটা করুণার সাথে যায় না। পরে আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তাআলা শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও করুণাময়, পরম দয়ালু। এর প্রমাণ হলো—

আল্লাহর শত্রুরা যখন শত্রুতা শুরু করে, তখন শুরুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন যাতে তারা নিজেদের জিদ থেকে ফিরে আসে। শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক হওয়ার যে সুযোগ দেন, এটাও তাঁর পক্ষ থেকে রহমত।

তিনি জালিমকে শাস্তি দিয়ে অন্য মানুষকে জুলুমের পথে চলার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাঁর এই শাস্তি ও সতর্কতা অন্যান্য বান্দার প্রতি রহমতস্বরূপ।

স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টির কাউকে শাস্তি দেওয়াটা জুলুম। এই প্রসঙ্গে রহমান নামটা এনে মুমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তি বান্দাদের জন্য জুলুম না। আল্লাহ তাআলা জুলুম থেকে পবিত্র। বরং তিনি ন্যায়পরায়ণ, বান্দাদের তিনি যথোপযুক্ত হিসাবই নিয়ে থাকেন।

শাস্তির প্রসঙ্গে রহমান নাম আসার মাঝে নিহিত প্রজ্ঞার আরেকটি দিক হলো তিনি কাফিরকে অথবা শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার সাথে মানায় এমন শাস্তিই দেন। অন্য ব্যক্তির কাজের শাস্তি তাকে দেন না। শাস্তির ফেরেশতাদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার সুযোগ দেন না। এমন শাস্তি তাকে বাড়িয়ে দেন না, যেটা পাওয়ার উপযুক্ত সে নয়।

আর এ সবই আল্লাহর রহমত। তাই এই আয়াত বা এর মতো আরও কিছু আয়াতে 'রহমান' পরিচয় আনা হয়েছে। আর এই নাম আনার পেছনে আল্লাহর এমন প্রজ্ঞা আছে, যা আমরা জানি না। কেবল আল্লাহ জানেন। কিন্তু আমি যে জিনিসটা

[১] সুরা মারইয়াম। আয়াত : ৪৫

বলতে চাই সেটা হলো, কাফির বান্দাকে শাস্তি দেওয়া এবং তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যদি এমন হয়, তাহলে যে মুমিন ভগ্ন হৃদয়ে তার কাছে নেকি চায় এবং কোনো কিছু প্রত্যাশা করে, তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কেমন হবে?

মৃত্যু একটি নিয়ামত

আপনার মাথায় কি কখনো এসেছে যে, মৃত্যুও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের একটা নিদর্শন হতে পারে? মৃত্যু না থেকে যদি শুধু জীবন থাকত, তাহলে সেটাও অসহনীয় হয়ে যেত?

আসুন আমরা কল্পনা করি, আল্লাহ মানুষকে এক হাজার বছর করে জীবন দিলেন। অর্থাৎ এর আগে তাদের মৃত্যু হবে না এমনটা নির্ধারণ করে দিলেন।

এবার বলুন, এই বিশ্বজগতে জীবনধারণের উৎস কি পাঁচ হাজার কোটি মানুষের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হবে? আর যদি এর চাইতে বেশি হয় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে?

অক্সিজেন, পানি, উদ্ভিদ ও পশুর মতো জীবনের নানান উৎসের কথা বাদ দিন। শুধু বলুন পৃথিবীর মাটিতে কি এত পরিমাণ মানুষের জায়গা হবে?

বড় বড় জায়গার কথা চিন্তা না করে নিজেদের বাড়িতেই প্রবেশ করি। কল্পনা করুন আপনি কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে দেখলেন আপনার বাড়িতে ৫০ জন বৃদ্ধ মানুষ, যারা আপনার দাদা-দাদী, নানা-নানী। শত শত বছর ধরে আপনার কাছে তারা আছে। আপনাকে এতগুলো মানুষের দেখভাল করতে হবে, তাদের সুখকর জীবনের উপকরণের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে!

আপনার ওপর একটা বৃদ্ধাশ্রমের দায়িত্ব এসে পড়বে। সেটা আপনার দাদা-পরদাদায় ভরতি থাকবে। আপনার ওপর কর্তব্য হবে তাদের আনুগত্য করা, খাওয়ানো, পান করানো এবং শত শত বছরের জমে যাওয়া ক্লান্তি হ্রাস করা।

আপনি আপনার কাজ করার সময় কীভাবে পাবেন? বাচ্চাদের সাথে খেলবেন কখন? এত এত দাদা-পরদাদার দেখাশোনা করার জন্য তো ২৪ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয়।

তারপর যদি আপনার বয়স বাড়ে, দেখবেন তাদের খাটের পাশে আপনারও একটা খাট জুটেছে। আপনি হয়ে যাবেন নাতিদের দাদা। তারপর নাতির নাতিরও দাদা। বৃদ্ধ বয়সের যত কষ্ট মানুষ ভোগ করে, সেটা আপনিও ভোগ করবেন। এত এত

বছরের ক্লান্তি আপনাকে সয়ে যেতে হবে!

মৃত্যু নামে কিছু না থাকলে এই পৃথিবীটা ভয়ানক এক পরিবেশে পরিণত হতো!

কতই না মহান সে রব, আমাদের অপছন্দনীয় বিষয়ে যার অনুগ্রহ আমাদের পছন্দনীয় বিষয়ে অনুগ্রহের চাইতে বিশাল ও মহান!

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন

আল্লাহর আদেশগুলোর মাঝে একটা বিস্ময়কর আদেশ হলো বান্দাদেরকে তাঁর রহমতের নিদর্শনগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা! জীবনের গতিময়তা এবং ব্যস্ততা আমাদেরকে সেই সব নিদর্শনের দিকে তাকানোর বিষয়টা ভুলিয়ে দিয়েছে। আমাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষই এখন আর সেটা করে না। এমনকি অনেকের মাথাতেই আসে না যে, এমন বিষয়ে কিছু একটা বর্ণিত হতে পারে!

আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন বহু জিনিসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অনুগ্রহের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে মৃত জমিন সজীব হয়ে ওঠার মাঝে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে বলছেন—

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا... ﴿٥٠﴾

অতএব তুমি আল্লাহর রহমতের নিদর্শনগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও। কীভাবে তিনি জমিনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন।[১]

আপনি যদি দেখতে পান একজন বাবা তার ছোট বাচ্চাকে আদর করছে, সন্তানের প্রতি তার হৃদয়ভরা ভালোবাসা, তাকে স্নেহ করে বাবা আনন্দ পাচ্ছে, তাহলে আল্লাহর রহমতের নিদর্শন খুঁজে বের করুন। দেখুন কীভাবে আল্লাহর রহমত বাবার মুখে এমন সুন্দর হাসি ফুটিয়ে দিয়েছে, তার মাঝে এমন চমৎকার অনুভূতির জন্ম দিয়েছে।

আপনি যদি দেখতে পান একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে কয়েক প্রকারের খাবার খাচ্ছে, খাবারের স্বাদ ভোগ করার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, ভীতি-আশঙ্কায় খাওয়া থেকে তার মন উঠে যাচ্ছে না, অসুস্থতা তার পছন্দের

[১] সূরা রুম, আয়াত : ৫০

খাবারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, তাহলে আল্লাহর রহমতের নিদর্শনের দিকে তাকান। এই উষ্ণ অনুভূতির পেছনে রয়েছে আল্লাহর রহমত।

বরং আপনি যে রহমতের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছেন, এর মাঝেও আছে আল্লাহর রহমত। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত না থাকলে আপনি দেখতে পারতেন না, শুনতে পেতেন না, কিছুই বুঝতে পারতেন না!

এই বিশাল জগতে আল্লাহর রহমতবিহীন কোন জায়গাটা আছে? এমন কোনো কাজ আছে দুনিয়ার বুকে, যেটা আল্লাহর রহমত ছাড়া ঘটে?

সকালবেলা আপনি যে বুলবুলি পাখির ডাক শুনতে পান, সেটা আল্লাহর রহমত। আল্লাহ জানেন এই সুন্দর আওয়াজ আপনাকে গত রাতের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। তাই আপনার জানালার পাশে বুলবুলিকে ডাকার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি ভাবছেন, এটা কাকতালীয়, অথচ এটা আল্লাহর রহমত!

এক বৃষ্টিমুখর দিনে আসমান থেকে নেমে আসা পানিতে রাস্তাগুলো যখন ভিজে একাকার, তখন আপনি যে বৃষ্টির গন্ধ বুকভরে নিচ্ছেন, এটাও আল্লাহর রহমত। তিনি জানেন এই সুগন্ধি আপনার ক্লান্ত-শ্রান্ত হৃদয়কে সজীব করে তুলবে। জীবনে নানা প্রতিবন্ধকতার জমে যাওয়া আস্তরণ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেবে!

সুকণ্ঠের অধিকারী এক কারির গলায় কুরআন শুনতে পারাটা জীবনের অন্যতম বড় রহমত! সকালগুলো মুহাম্মাদ রিফাত, আব্দুল বাসিত, মিনশাওয়ী আর হুসারির তিলাওয়াত দিয়ে শুরু করাটা একটা রহমত। চিন্তা করুন তো, আমাদের কানে যদি এই সুন্দর তিলাওয়াত না আসত, আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি বিনয় ও ভালোবাসায় ভরপুর করে না দিত, তাহলে জীবনটা কেমন হতো!

আপনার হৃদয়ের জানালাগুলো খুলে দিন। আল্লাহর নির্দেশের প্রতি নতিস্বীকার করে দৃষ্টিপাত করুন। চারদিকে আল্লাহর রহমতের নিদর্শনগুলোর দিকে। সেসব দিয়ে নিজের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে তুলুন। আপনার হৃদয়ে রবের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতি বাড়িয়ে তুলুন।

আল-জামিল

এমন কোনো সুস্থ মানুষ কি আছে যে সৌন্দর্য পছন্দ করে না, সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে না, সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলে না কিংবা সৌন্দর্যের মাঝে নিজের প্রাণ, মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায় না?

আমাদের রব সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্দর। তাঁর ব্যাপারে যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি জানতেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।'[১] তিনি আপন সত্তায় সুন্দর। অন্যের মাঝেও সৌন্দর্য তিনি পছন্দ করেন। তাই সকল কিছুকে সৌন্দর্যের নীতির ওপর সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্যের নিয়মকানুনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক শরিয়ত তিনি প্রণয়ন করেছেন।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাঁর নান্দনিক নামসমূহের অন্যতম হলো সুন্দর। তাঁর সৌন্দর্য চার স্তরে দেখা যায়। যথা : সত্তার সৌন্দর্য, গুণাবলির সৌন্দর্য, কাজের সৌন্দর্য আর নামের সৌন্দর্য।'[২]

আসুন আমরা একসঙ্গে এই নামে ভ্রমণ করি, এর সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও পূর্ণতা থেকে কিছু গ্রহণ করি।

সুবহানাল্লাহ

বলা হয়, সুলাইমান ইবনু দাউদ আলাইহিস সালাম একবার ঘুরতে বের হলেন।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৯১

[২] *আল-ফাওয়াইদ*, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ১৮২

তিনি তার কেদারায় বসে ছিলেন। তার সাথিরা তার সাথে কেদারার ডানে-বামে বসে ছিলেন। বাতাস তাদের স্পর্শ করছিল। আবার পাখপাখালি তাদের ছায়া দিচ্ছিল। এমন অবস্থায় তিনি ওপর থেকে বনি ইসরাইলের দুজন মহিলা দেখতে পেলেন। তাদের এমন মর্যাদা দেখে বনি ইসরাইলের দুই মহিলা খুব অবাক হয়ে বলল, 'সুবহানাল্লাহ! দাউদের পরিবার তো অনেক বড় রাজত্ব পেয়েছে।' সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেই দুজনের কথা শুনে ফেললেন। তাদের কাছাকাছি আসার পর বাতাসকে বললেন, 'থেমে যাও।' বাতাস থেমে গেল। তিনি বললেন, 'আমি এইমাত্র তোমাদের যখন দেখছিলাম, তখন তোমরা কী বলছিলে?' দুজন বলল, 'হে আল্লাহর নবি, আমরা আপনার ব্যাপারে শুধু ভালো কথাই বলেছি। আমরা বলেছি, 'সুবহানাল্লাহ! দাউদের পরিবারকে তো বড় রাজত্ব দেওয়া হয়েছে!' সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, 'তোমাদের "সুবহানাল্লাহ" কথাটা দাউদের পরিবারকে দেওয়া সকল কিছুর চাইতে উত্তম।'[১]

আমরা কল্পনাও করতে পারি না অথচ আল্লাহ এক মহান, সুন্দর বা অভিনব সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করলেন, যাকে দেখে কোনো এক যুগে তাঁরই এক বান্দা পর্যন্ত বলে ওঠে, 'সুবহানাল্লাহ!'

আল্লাহ সুন্দরকে সৃষ্টি করেন, কারণ তিনি সুন্দর। সুন্দর থেকে কেবল সুন্দরই আসে। আল্লাহ সুন্দরকে সৃষ্টি করেন, কারণ তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। তিনি সুন্দরকে সৃষ্টি করেন যাতে বান্দা এই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ইবাদত করে। আল্লাহ সুন্দরকে সৃষ্টি করেন, যেন বান্দার হৃদয়ও সুন্দরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে!

বিস্ময়কর ঝুড়ি

কয়েক বছর আগে আমি লক্ষ করেছি, একটি সূক্ষ্ম সুন্দর জিনিসের রয়েছে অপরিসীম সৌন্দর্য; সে জিনিসটা আমরা প্রায় প্রতিদিন দেখি, ধরি বা স্বাদ নিই! পর্যবেক্ষণের কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একটা দোকানে গিয়ে জিনিসটা কিছু পরিমাণ কিনব যাতে এর মাঝে থাকা আকর্ষণীয় সৌন্দর্য মন ভরে উপভোগ করতে পারি।

সেই অনবদ্য সুন্দর জিনিসটা হলো ফল!

আমি সবধরনের ফল অল্প অল্প করে কিনলাম। একটা পাত্রে সেগুলো রেখে দিলাম। তারপর আমি আর আমার ছেলেরা বসে বসে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

---

[১] *তারিখু দিমাশক*, ইবনু আসাকির, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ২৭৫

আর 'সুবহানাল্লাহ' পড়ে চললাম।

আমি জানতাম না এর মাধ্যমে আমি নিজেকে এমন একটা ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত করে তুলছি যেটা ভবিষ্যতে আমার ওপর চেপে বসবে। চিন্তাটা হলো সৃষ্টির সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ। সৃষ্টিকুলের সৌন্দর্য দেখে মানুষের মনে প্রশান্তি অনুভূত হওয়াও সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য। সৃষ্টির সৌন্দর্য স্রষ্টার সৌন্দর্যের প্রমাণ। সৌন্দর্যকে যিনি সৃষ্টি করবেন, তিনিও সুন্দরই হবেন।

কুরআন ও হাদিসে বেশি বেশি তাসবিহ পাঠের কথা বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে এত চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাসবিহ পাঠ করে। গভীরভাবে চিন্তা কিংবা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে না।

কমলা আর ডালিম

কমলার অস্তিত্ব দেখলেই আপনি 'সুবহানাল্লাহ' বলতে বাধ্য হবেন! আপনি এই কমলা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেননি, কমলার প্রতি আপনার প্রয়োজন আছে সেটাও আপনি জানতেন না, তবু কমলার যে গুণাগুণ, তা জেনে আপনি সুবহানাল্লাহ বলতে বাধ্য হবে।

কী সুন্দর গোলাকৃতিতে তিনি এই কমলা তৈরি করলেন। ধরতেও কত হালকা, এটা ভাবলে দ্বিতীয়বার আপনি সুবহানাল্লাহ বলবেন।

তারপর একটি চমৎকার রঙে এটাকে রঙিন করা হয়েছে, এটা ভেবে আপনাকে আরেকবার সুবহানাল্লাহ বলতে হবে।

ভেতরে এত সুন্দর করে কমলার কোষগুলো থরে থরে সাজানো হয়েছে, এটা দেখে অন্তরের গভীর থেকে আরও একবার সুবহানাল্লাহ বলবেন আপনি।

কমলার কোষ যখন মুখে পুরবেন, যে অভিনব স্বাদ আপনি অনুভব করবেন তার জন্য আপনার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন রূপ নেবে তাসবিহতে।

একটি মাত্র কমলার জন্য আপনি মহান স্রষ্টার কত বার তাসবিহ পাঠ করলেন! তাহলে যদি রং-বেরঙের সুস্বাদু ফলের ঝুড়ি আপনার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? আর যদি ফলমূল ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর অভিনব বিস্ময়কর সৃষ্টির দিকে তাকান, তাহলে কেমন হবে? সুবহানাল্লাহ! আপনি কতই না মহান!

একবার আমি স্বচ্ছ রঙের একটা ডালিম দেখেছিলাম। ভেতরে দানাগুলো কী

নিখুঁতভাবে সাজানো। দেখার পর এক ভিন্ন অনুভূতিতে আমার মনটা ভরে গেল। আমি তখন লিখেছিলাম, ডালিমের অনন্য আকৃতি, আকর্ষণীয় রং, মন-জুড়ানো স্বাদ, দানাগুলোর নিখুঁত অবস্থান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নাস্তিকের অহংকারের মুখে চপেটাঘাতের জন্য যথেষ্ট।

প্রতিটি ফলে চোখ বোলানোর সময় আমার মাথায় প্রশ্ন এসেছিল, কেন আল্লাহ ফলকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করলেন? ফলে যে আঁশ, ভিটামিন এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতা আছে, এগুলোই কি যথেষ্ট ছিল না? এসবের পাশাপাশি ফল দেখতে এত সুন্দর কেন হলো? প্রশ্নটা আমার মাথায় প্রায়ই আসত। কিন্তু আমি এমন কোনো উত্তর পাই নি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়, আমি যে উত্তর পেয়েছি সেটা শুধু অনুভবই করা যায়।

প্রজাপতি

নাস্তিকরা প্রজাপতির সৌন্দর্য দেখে। এত বিস্ময়কর নকশা করা আর সুন্দর রং-বেরঙের ডানাগুলোতে আল্লাহর সৃষ্টির অভিনবত্ব তাদের নজরে পড়ে। কিন্তু তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে স্রষ্টার সামনে অবনত করে না। তারা 'সুবহানাল্লাহ' বলে না বরং এমন বিপত্তি থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বেড়ায়। তারা বলে, এই সব নকশা আর রং 'প্রকৃতি' দিয়েছে যেন একটি প্রজাপতি অন্য প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করে বাচ্চা জন্ম দেয় এবং তাদের বংশধারা টিকে থাকে।

হাস্যকর কথাবার্তা! আল্লাহর থেকে পালানোর জন্য কত অদ্ভুত কথা যে তারা নিয়ে আসবে! কিন্তু পালানোর ক্ষেত্রে তাদের এই যুক্তি কতই না দুর্বল!

তাহলে তারা স্ট্রবেরির সৌন্দর্যের ব্যাপারে কী জবাব দেবে? প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণেই কি স্ট্রবেরির এমন রং? আকৃতি এতটা অনন্য? স্বাদ এতটা চমৎকার? এগুলো কি বীজের 'দৃষ্টি আকর্ষণের' জন্য?

তাহলে আনারস, আঙুর, চেরি আর আপেলের ক্ষেত্রে কী হবে? ডালিম আর আঙুরের ব্যাপারে তারা যে সংকটে পড়বে সেটা থেকে বাঁচবে কী করে? খেজুর গাছে এমন কী আছে যেটার কারণে সেটা এত সুন্দর, এত উঁচু?

প্রকৃতি যেহেতু আবিষ্কার করেছে হলুদ রং পুরুষকে আকৃষ্ট করে, তাহলে সব প্রজাপতির রং এক হলো না কেন? কেন কিছু প্রজাপতি হলুদ, কিছু নীল আর কিছু সাদা-কালো মিশ্রিত?

আর যদি নর প্রজাপতিই নারী প্রজাপতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, সে জন্য নারী

প্রজাপতির আকর্ষণীয় রং থাকা জরুরি হয়, তাহলে পুরুষ প্রজাপতিগুলো কেন এমন সুন্দর রঙের? নারী প্রজাপতিই যেখানে কাম্য, নর প্রজাপতির মতো আকৃষ্ট নয়?

কেন পুরুষ কীটপতঙ্গ মানুষের মতোই রুচিশীল? সেগুলোও রং, আকৃতি বা সাজ দেখে আকৃষ্ট হয়? তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, তাদেরকে মুগ্ধ করে?

নর প্রজাপতির চাহিদা অনুযায়ী যদি 'প্রকৃতি' রং পরিবর্তন করে দিতে পারে, তাহলে কেন নর প্রজাপতি রুচি বা চাহিদাকেই বদলে দিচ্ছে না? কেন নারী প্রজাপতিকে আকর্ষণীয় করে তুলছে?

নাস্তিকের মাথায় কখনো এই ভাবনা আসে না যে, আল্লাহকে অস্বীকার করার আগে তাকে এই বিশ্বজগতের সমান অগণিত প্রশ্নের উত্তর হাজির করতে হবে। এই প্রশ্নগুলো তার ভেতরে সুপ্ত আল্লাহর অস্তিত্ব, মাহাত্ম্য, ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের স্বীকৃতি প্রদানের অনুভূতিকে প্রকাশ করে দেবে!

আমি এই কথাগুলো লেখার সময় আমার ছেলেকে বললাম, 'তোমার দেখা একটা সুন্দর জিনিস বলো তো।' তার উত্তর শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। তার বয়স মাত্র ৮ বছর। সে বলল, 'পুরো জীবনটাই সুন্দর!'

আল্লাহ তাকে এবং সকল মুসলিমের সন্তানকে হিফাজত করুন। সে সত্য কথাটাই বলেছে। এই জগতের বুকে এমন কোনো স্থান আছে যেখানে সৌন্দর্য নেই, মুগ্ধতার কোনো উপাদান নেই?

সকাল বেলার সুমধুর সুর

এক লোক দুশ্চিন্তা নিয়ে হাজির হলো। সে নাকি এমন কথা বলেছে যার কারণে আশঙ্কা হচ্ছে বউ তালাক হয়ে গেছে। ইমামকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ইমাম, আমি বউকে বলেছি তুমি যদি চাঁদের থেকে সুন্দরী না হও, তাহলে তুমি তালাক।' ইমাম বললেন, 'তোমার বউ তালাক হয়নি।' লোকটা বলল, 'কীভাবে? চাঁদ তো তার থেকে সুন্দর!' ইমাম বললেন, 'বরং সে সুন্দরী। তুমি কি কুরআনে আল্লাহর বাণী পড়োনি?'—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

আমি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।[১]

[১] সুরা তিন, আয়াত : ৪

আমাদের সমস্যা হলো আমরা মানুষের সৌন্দর্যকে তার চোখের ধরন, চেহারার ছাপ, হাসির সৌন্দর্যে সীমিত করে দিই। আমরা তার সামগ্রিক আকৃতিতে থাকা সৌন্দর্যের কথা ভুলে যাই। চার পায়ে না হেঁটে মানুষ যে দুই পায়ে হাঁটছে, এটা কত সুন্দর! সে কথা বলার সময় এত চমৎকারভাবে হরফগুলো উচ্চারণ করে? কেমন হতো যদি মানুষ গরু, বিড়াল বা কুকুরের মতো আওয়াজ করে কথা বলত? আমরা তার ত্বকের সৌন্দর্যের কথা ভুলে যাই, কেমন হতো যদি তার সারা শরীর পালকে বা পশমে ঢাকা থাকত?

সৌন্দর্যের অন্যতম একটা নাট্যমঞ্চ হলো সকালবেলা। সকালের প্রতিটি জিনিস সুন্দরভাবে সাজানো। ফজরের সুমধুর আওয়াজে আপনার ঘুম ভাঙে। এক জাদুকরী নীল আলোকচ্ছটা আপনাকে ছুঁয়ে যায়। তারপর সূর্যের রশ্মি তার তুলি দিয়ে দিনের শুরুটা এঁকে দেয়। শুরু হয় পাখির কলতান।

আমি কি 'পাখি' বললাম?

নানা প্রকারের পাখিকে বাদ রেখে কি সৌন্দর্যের বিবরণ আমরা দিতে পারব? ক্যানারির গান, বুলবুলির সুমধুর ডাক আর লাভ বার্ডের কিচিরমিচিরের বর্ণনা ছাড়া কি সৌন্দর্যের আলাপ জমতে পারে?

এমনকি কবুতরের গুরুগম্ভীর স্বরও স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বহন করে। তিনি রহস্যময় জিনিসগুলোকে সুন্দর একটা ফলকের অংশ বানিয়ে দেন। এই রহস্যময় জিনিসগুলো না থাকলে অনেক কিছু প্রাণ হারাত।

নানান রঙের এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখিগুলো দেখুন। বুঝতে পারবেন, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। শুধু আপনার জন্য পছন্দ করেন না বরং জগতেই তিনি সুন্দরকে চান। জগৎ যেন সুন্দরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সুন্দরের মুগ্ধতা ছড়ানো বিবরণে ভরপুর হয়ে ওঠে, এমনটাই আল্লাহ পছন্দ করেন।

নাস্তিকরা আসলেই বোকা!

যে লোকটা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করছে না, তাকে আপনি সঠিক পথে ফেরানোর জন্য যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। শুধু তাকে শুনিয়ে দিন ক্যানারির কণ্ঠ, দেখিয়ে দিন রোজেলা পাখির রং আর নিশি বকের খেলায় মেতে ওঠার দৃশ্য!

যে লোকটা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তার উচিত অদৃশ্য কিছু বিষয়ে নিজের জানার অক্ষমতা স্বীকার করা। যে মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে,

তার চাইতে সে বেশি কিছু জেনে যেতে পারবে, এটা মনে না করা।

যে লোকটা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাকে অনেকখানি বোকা হয়ে যেতে হয়। যাতে সে তার জীবনে প্রতিনিয়ত উপস্থিত আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে থাকা অসংখ্য দলিল-প্রমাণ-আলামত দেখার পরও সেগুলো চোখ বুজে এড়িয়ে যায়।

নাস্তিককে এত সব পরস্পরবিরোধী, কাল্পনিক আর বোকামিপূর্ণ বিষয় বিশ্বাস করতে হলে অবশ্যই অদৃশ্য অনেক কিছুতে বিশ্বাস করতেই হবে!

আল-ওয়াহহাব

আল্লাহর নান্দনিক নামগুলোর ভেতরে একটা হলো আল-ওয়াহহাব। এই নামটা বদান্যতার প্রতিবিম্ব। 'ওয়াহহাব' এই বিশেষ্য দিয়ে সবসময় আধিক্য বোঝানো হয়। আল্লাহ তাআলা শুধু দাতা নন, সুমহান দাতা। তিনি অনেক বেশি দান করেন, বদান্যতা প্রদর্শন করেন। তাই নিজের নাম দিয়েছেন 'আল-ওয়াহহাব'।

যে চায় আর যে চায় না, উভয়কে তিনি দেন!

যার প্রয়োজন এবং যার প্রয়োজন নেই, উভয়কে তিনি দেন!

যে ইবাদত করে আর যে ইবাদত করে না, উভয়কে তিনি দেন!

তিনি ওয়াহহাব

কারণ তিনি অনেক দান করেন। দানশীলরা আপনাকে একবার দেয়। আপনি দ্বিতীয়বার চাইলে তারা হয়তো বিরক্তি প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার দানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আপনি তাঁর কাছে চাইলে তিনি সন্তুষ্ট হন। বরং আপনাকে তিনি নির্দেশ দেন যেন আপনি তাঁর কাছে চান।

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... ﴿٦٠﴾

তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।[১]

[১] সুরা গাফির, আয়াত : ৬০

আল্লাহ আপনাকে যে কত কিছু দিয়েছেন, সেটা গুনতে বসলে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। তাঁর কাছে যদি কিছু পেতে চান, তাহলে আপনার করণীয় হলো আল্লাহ আপনাকে আগে যা দিয়েছেন তা দুআয় বলবেন। আগের প্রাপ্ত দানের উসিলা দিয়ে নতুন কিছু আপনি পেয়ে যাবেন! আল্লাহর নবি যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার দুআয় বলেছিলেন—

...وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

হে আমার রব, আমি আপনাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি![১]

আগে আপনাকে যতবার ডেকেছি, ততবার সফল হয়েছি। আপনি আমার দুআ শুনেছেন। তাই এই দুআটাও শুনুন। ইবনু আশুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে চেয়েছি অথচ আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমনটা কখনো হয়নি। অর্থাৎ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে চাইলেই পেয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিলেন।'[২]

তিনি মহান কিছু দান করেন। মানুষ সাধারণত টাকা-পয়সা দান করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যত নিয়ামত দান করেন তার মধ্যে সর্বনিম্ন নিয়ামত হচ্ছে টাকা-পয়সা বা অর্থসম্পদ। তিনি সরাসরি জীবন দেন, আকল দেন, বংশধর দেন, এমনকি নবুয়ত, বেলায়াত, রাজত্বও দেন। তিনি এমন কারামত দান করেন যা দেখে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়, ভাবনার কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

হ্যাঁ, তিনি দানের মাধ্যমে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। তিনি সুলাইমানকে এমন রাজত্ব দিয়েছেন, যা পরবর্তী কারও জন্য দেননি।

যাকারিয়া বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি যাকারিয়াকে বংশধর দেন।

তিনি নুহ আলাইহিস সালামের জন্য সাহায্য নিয়ে আসেন। এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে পৃথিবীর সব কাফির ডুবে যায়। আর সেটা তারই দুআয় সাড়া দিয়ে।

মুসার জন্য তিনি সাগর বিদীর্ণ করে দেন। ঈসাকে আসমানে তুলে নেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহায় রাতের সফরে নিয়ে যান।

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৪

[২] *আত-তাহরির ওয়াত-তানওয়ির*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৬৬

তিনি শত্রুদেরও দান করেন। একজন দুনিয়ার যত বড় বদান্য ব্যক্তিই হোক না কেন, সে কখনো শত্রুদের প্রতি দয়াশীল বা দানশীল হয় না। কিন্তু ওয়াহহাব সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যারা শত্রুতা করে, তাঁকে যারা গালমন্দ করে, তাদেরকেও তিনি দান করে চলেন। তাঁর দানের খাতায় তাদের নামও আছে। এই দান দেখে বান্দারা দৃঢ়বিশ্বাসী হয় যে, আল্লাহ দানশীল। ইবলিস থেকে বড় শত্রু কে আছে, যে তাঁর কাছে জীবন চেয়ে বলেছিল—

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে, সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, হে আমার রব![১]

তিনি তাকে এমন জীবন দিয়েছেন যা তার সবচেয়ে কাছের নবি, সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকেও দেননি। তাকে প্রায় স্থায়ী এক জীবন দিয়ে বলেছেন—

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[২]

এত কিছুর কারণেই তো আল্লাহর নাম 'আল-ওয়াহহাব'।

অফুরান সম্পদ বনাম আপনার দুটি চোখ

আমাদের সমস্যা হলো আমরা আমাদের যে নিয়ামত আছে, সেটার কদর করি না। নাহলে আমরা 'ওয়াহহাব' নামটার অর্থ বুঝে যেতাম। তাঁর কাছেই সবকিছু চাইতাম।

আপনার চোখের মূল্য কী? আপনি না চাইতেই আল্লাহ আপনাকে যে চোখে দিয়েছেন? এমনকি চোখের প্রয়োজন হওয়ার আগেই?

কল্পনা করুন একজন লোকের কাছে কারুনের মতো রাজত্ব আছে, কিন্তু সে অন্ধ।

---

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ৩৬

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ৩৭-৩৮

সে আপনাকে বলল আপনার চোখ তাকে দিয়ে দিতে, বিনিময়ে তার সম্পদ থেকে আপনি যা চান তাই সে দেবে। আপনি তার কাছে কত চাইবেন?

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিই, আপনাকে কারুনের সকল সম্পদ দেওয়া হলেও আপনি নিজের চোখ ছেড়ে দেবেন না। এটা এমন এক নিয়ামত যা আপনি খুব কমই অনুভব করেন।

তাহলে বাকি নিয়ামতগুলো যদি গুনতে শুরু করেন? অথবা যে নিয়ামতটা আপনার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ? তিনি আপনার শরীরে বিলিয়নের চাইতেও বেশি নিয়ামত দিয়েছেন! আপনি কি জানেন, কেন? কারণ তিনি ওয়াহহাব। না চাইতেই তিনি দিয়ে দেন। প্রশ্ন হলো, না চাইতেই যেহেতু তিনি দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর কাছে চাওয়ার পর তিনি কত বেশি দেবেন আমাদের?

পাপকাজের ইতি টানুন

এক যুবক একটা কোম্পানিতে বেশ সম্মানজনক পদে চাকুরি করে। তার বেতনও বেশ ভালো। তার গাড়ি, বাড়ি আর স্ত্রী আছে। জীবনটা বেশ আরামের। একদিন সে আমাকে জানাল যে, যখন সে পূর্বাঞ্চলের একটা কোম্পানিতে সাধারণ কর্মচারী ছিল, তখন এই নিয়ামতগুলো ছিল না তার জীবনে। সে তখন বেশ কিছু পাপ কাজে জড়িত। তার ভাষায়, একবার আমি উমরাহ করতে মক্কায় যাই। উমরার শেষে সিদ্ধান্ত নিই পাপে ভরপুর জীবনে একটা ফুলস্টপ দিয়ে সমাপ্তি টানব। সেবার হারামে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করি যে আমার অন্ধকার ইতিহাস সেখানেই শেষ হবে। নতুন জীবনের সূচনা ওখান থেকেই হবে। সাঈ করার সময় হঠাৎ পুরাতন এক বন্ধুকে পেলাম। তার সার্বিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়ার পর তাকে মক্কায় অমুক কোম্পানির শাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে আমাকে দেখিয়ে দিলো। পরদিন আমি সেখানে গিয়ে একজন দায়িত্বশীলের সাথে পরিচিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বেশ চমৎকৃত হলেন। ঠিক তার পরের দিন আমার সাক্ষাৎকার হয় জেদ্দায় হেডকোয়ার্টারে। সাক্ষাৎকারে যাওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল আমার জন্য সুপারিশ করে দেন। আমি সফলভাবে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরি পেয়ে যাই। তারপর থেকে আমার সুখের দরজা খুলে গেছে! ওয়াহহাব তাকে নিয়ামতে ডুবিয়ে দিয়েছেন, কারণ সে বাস্তবেই বিচ্যুতির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তওবা করে সুখী জীবন শুরুর মাঝে পার্থক্যটা মাত্র একদিনের!

এই যুবকই একমাত্র যুবক নয়, যার ওপর আল্লাহ রিজিক মুষলধারে বর্ষিত করেন। অর্থহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলেন। এমন যুবকের সংখ্যা অগণিত। ওয়াহহাব জীবনের এমন কোনো দরজা রাখেননি, যেখানে তাঁর দান নেই। শুধু আপনি বলুন,

'হে আল্লাহ!' এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের অপেক্ষায় থাকুন।

বরকতময় ব্যর্থতা

সুলাইমান আলাইহিস সালামের কথা পড়ে আমি কী যে অবাক হয়েছি! তিনি কীভাবে একই সাথে ক্ষমাও চাইলেন আবার আল্লাহর কাছ থেকে দানও চাইলেন! তিনি বললেন—

...رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي...﴿٣٥﴾

হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমাকে দান করুন।[১]

আমরা বিশ্বাস করতাম আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর তাঁর কাছে চাইতে হয়। কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এক নতুন শিক্ষা দিলেন। তিনি যেন শেখালেন, ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আপনার কল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয় চেয়ে বসুন।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেসময় সুন্দর বাড়ি, সুরম্য প্রাসাদ অথবা স্বর্ণের দ্বীপ চাননি। না! তিনি চেয়ে বসলেন এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কেউ পাবে না। দুআটার সমাপ্তি টানলেন তার এক মহান নাম দিয়ে। এমন নাম, যেটা বলার মাধ্যমে চিরঞ্জীব আল্লাহর সামনে বিনত হওয়া যায়। দুআর শেষে তিনি বললেন—

...إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴿٣٥﴾

আপনিই মহান দাতা।[২]

মহান কিছু দান করা আপনার জন্য কিছুই নয়! আপনার কাছে যে আশা করে, তাকে তার কল্পনার চাইতেও বেশি দেওয়া আপনার জন্য স্বাভাবিক!

সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজের জন্য রাজত্ব চান। কিন্তু আল্লাহ তাকে এক বিস্ময়কর রাজত্ব দেন। বাতাসকে তার অধীন করে দেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা

---

[১] সুরা স-দ, আয়াত : ৩৫

[২] সুরা স-দ, আয়াত : ৩৫

সেখানে যেতে পারতেন। বাতাস তার হুকুমে শান্তভাবে সেখানে প্রবাহিত হতো। প্রাসাদ নির্মাতা এবং ডুবুরি জিনেরা তার অনুগত হয়ে যায়। বহু জিন তার শেকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। বায়ুর প্রবাহে তিনি ও তার সভাসদেরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যেতেন। জিন শয়তানেরা তার নির্দেশে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে তার জন্য সবচেয়ে দামি পাথর এবং গুপ্তধন নিয়ে আসত। তার জন্য সবচেয়ে সুন্দর ও বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে দিত।

আপনি কি মনে করেন আল্লাহ এই বিস্ময়কর জিনিসগুলো দিয়েছেন যেন আমরা শত শত বছর আগে মরে যাওয়া সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আঁকড়ে ধরি? নাকি সেই চিরঞ্জীব সত্তাকে আঁকড়ে ধরি যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না এবং শুধু তাঁর কাছেই যেন প্রার্থনা করি?

আপনি কি মনে করেন আল্লাহ এই দানগুলো করেছেন যেন আমরা শুধু কুরআনের অভিনব গঠনশৈলী পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু অর্থ জানা থেকে বিমুখ থাকি? নাকি আমরা এই কথাগুলো পড়ে দুআ আর জিকিরের রূপ দান করি, সেগুলো দিয়ে অন্ধকার রাতের সিজদাগুলোকে সুরভিত করে তুলি?

আপনার জীবনকে তিনি প্রয়োজনে ও চাহিদায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। তারপর আপনাকে বলেছেন, 'আমি সুমহান দাতা। তারপরও তুমি সরল সমীকরণে কেন অগ্রসর হচ্ছ না?' সরল সমীকরণ হলো, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' এখন বুঝলে তো?

চাইতে থাকুন। আপনার চাওয়ার ছাদকে যতটা সম্ভব উঁচু করে দিন। আমি আপনাকে এখন এমন দুআর ঘটনা বলব, যার কোনো ছাদ নেই।

ছাদ-বিহীন দুআ

আমরা জানি কুরআন কারিমে নবিদের ঘটনাগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন আমাদের কাছে আদর্শে পরিণত হয়, আমরা যেন তাদের অনুসরণ করি।

কুরআনে নবিদের দুআগুলোতে চোখ বোলাতে গিয়ে যে জিনিসটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা হলো সেগুলো খুবই কাছাকাছি! কুরআনে নবিদের যে দুআগুলো কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, প্রতিটার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। আপনি আমার সাথে এখন মনোযোগ দিলে অবাক হবেন! বৈশিষ্ট্যটা হলো, 'দুআর অভিনবত্ব!'

নবি-রাসুলগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত দুআ করতেন না বরং ব্যতিক্রমী দোয়া

করতেন।

যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের কথা আমরা কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করলাম, তিনি আল্লাহর কাছে এক বিস্ময়কর দুআ করেন। তিনি বলেন—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং এমন রাজত্ব দান করুন যেটা আমার পরে আর কারও জন্য থাকবে না। আপনিই সুমহান দাতা।[১]

তিনি আল্লাহর কাছে রাজত্ব চাননি, মহান রাজত্বও চাননি। তিনি এমন রাজত্ব চেয়েছেন, যেটা তারপরে আর কারও জন্য থাকবে না, যে রাজত্বের বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে আর কেউ পাবে না। আল্লাহর সাড়া কেমন ছিল? দুআর পরপরই তিনি সাড়া দিয়ে বলেন—

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

ফলে আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার আদেশে যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত, সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো। আর (অধীন করে দিলাম) শয়তানদের মাঝে প্রত্যেক ভবন-নির্মাতা ও ডুবুরিকে। আর শেকলে আবদ্ধ আরও অনেককে। এটা আমার অনুগ্রহ। অতএব আপনি এটি বিনা হিসাবে দান করুন অথবা নিজের জন্য রেখে দিন।[২]

নুহ আলাইহিস সালামকে যখন তার সম্প্রদায়ের কাফিররা কষ্ট দিলো, তখন তিনি চাইলে নিজ জাতির ধ্বংসের দুআ করতে পারতেন। তিনি কিন্তু সেটা করলেন না বরং ব্যাপকভাবে দুআ করে দিলেন—

[১] সুরা স-দ, আয়াত : ৩৫

[২] সুরা স-দ, আয়াত : ৩৬-৩৯

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

হে আমার রব, আপনি পৃথিবীর বুকে কোনো কাফির অবশিষ্ট রাখবেন না।[১]

তিনি জমিনের বুকে থাকা সব কাফিরের বিরুদ্ধে দুআ করে দিলেন! বিস্ময়কর এক দুআ। যেমন দুআ, তেমন দ্রুতই ছিল তার জবাব! আল্লাহ তাআলা বললেন—

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

তখন আমি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির পানি দ্বারা (পানি বর্ষণের জন্য) আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম। আর জমিন বিদীর্ণ করে ঝরনা বের করলাম। ফলে পানি মিলিত হলো পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে।[২]

যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দুআ ছিল আরও বেশি অবাক করার মতো। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে, শরীর শুকিয়ে গেছে, মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে, তার ওপর স্ত্রী বন্ধ্যা; তবু তিনি দুআ করলেন—

...رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

হে আমার রব, আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখবেন না। আপনি সর্বোত্তম ওয়ারিশ।[৩]

এত এত আলামত দেখলেই যেন মনে হয় এমন অবস্থায় সন্তান হওয়া প্রায় অসম্ভব! কিন্তু অদ্ভুত দুআ দেখে যাকারিয়া কি দমে গিয়েছিলেন? না, বরং তিনি দুআটাকে আরও অভিনব করে বললেন—

---

[১] সুরা নুহ, আয়াত : ২৬

[২] সুরা কমার, আয়াত : ১১-১২

[৩] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৯

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦

অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে আমার রব, তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন।[১]

আল্লাহর নবি মুসা আলাইহিস সালাম তার রবের কাছে বিনয়ের সাথে চেয়েছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর সাড়া অনবরত নেমে আসতে থাকে। এই দুআগুলোর মাঝে একটা দুআ ছিল খুবই অবাক করার মতো! তিনি তখন মাত্র নবি হয়েছেন। তারপরই রবের কাছে চাইছেন যেন তার ভাই হারুনকে নবি করে দেওয়া হয়! তিনি বলেন—

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝٢٩ هَارُونَ أَخِي ۝٣٠

আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন, আমার ভাই হারুনকে।[২]

মুসা ছাড়া আর কেউ অন্য কারও জন্য নবুয়তের দুআ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই!

দুআর পরপরই সুমহান দাতা আল্লাহ বললেন—

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝٣٦

মুসা, আপনি যা চেয়েছেন, আপনাকে তা দেওয়া হলো।[৩]

তিনি হারুনকে মুসার সাথে নবি করে দিলেন যেন তাকে সাহায্য করেন। নবুয়তের মতো এক সুউচ্চ স্তর আল্লাহ এমন বান্দাকে দান করলেন, যে বান্দার মাথায়

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫-৬

[২] সুরা ত-হা, আয়াত : ২৯-৩০

[৩] সুরা ত-হা, আয়াত : ৩৬

কখনো নবুয়তের ভাবনাই আসেনি। শুধু এ কারণেই দিয়েছেন যে, তার ভাই তার জন্য দুআ করেছেন!

আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম

কুরআন পড়তে গিয়ে আমি ওয়াহহাব নামটি এবং দান করার সাথে সন্তান দেওয়ার সুদৃঢ় সম্পর্ক পেলাম। হ্যাঁ, কুরআনে জ্ঞান, রাজত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বংশধর চাওয়া এবং দেওয়ার সাথে এই নামের একটা দৃঢ় ও সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে।

আপনি পড়ুন—

...رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً... ﴿٣٨﴾

হে আমার রব, আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন।[১]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ... ﴿٣٩﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন।[২]

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

হে আমার রব, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।[৩]

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً... ﴿٧٢﴾

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৮

[২] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৯

[৩] সুরা সফফাত, আয়াত : ১০০

আর আমি ইবরাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক আর অতিরিক্ত পুরস্কারস্বরূপ ইয়াকুবকে।[১]

...وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ...﴿٩٠﴾

এরপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া।[২]

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ...﴿٣٠﴾

আমি দাউদকে দান করেছি সুলাইমান।[৩]

...يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্রসন্তান দান করেন।[৪]

ঈমানি জ্ঞান এবং বিবেকের দাবি হলো আপনি চাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একজন শাসকের কাছে সম্পদ চাইতে গিয়ে বলবেন না, 'হে বিনয়ী!' অথবা 'হে সাহসী! আমি আপনার কাছে সম্পদ চাই।' বরং তাকে আপনি বদান্যতা, পরোপকারী এবং কল্যাণকারী হিসেবে ভূষিত করবেন।

অনুরূপভাবে আপনি রব্বুল আলামিনের কাছে বংশধর চাওয়ার ক্ষেত্রে 'ওয়াহহাব' নামের চাইতে উপযুক্ত কোনো নাম নেই। 'ওয়াহহাব' তথা দান করার গুণের

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭২

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০

[৩] সুরা স-দ, আয়াত : ৩০

[৪] সুরা শুরা, আয়াত : ৪৯

চাইতে মানানসই আর কোনো গুণ নেই। তবে দুআতে আপনার অন্তর হাজির থাকতে হবে, মনে দৃঢ়তা থাকতে হবে আর অনুনয়-বিনয় করে আপনাকে চেয়ে যেতে হবে। আমাদের রব সুমহান দাতা। কোনো কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না। কোনো কিছু তাঁর কাছে বড় বিষয় নয়।

সর্বাধিক দানশীল তিনি

আল্লাহর বদান্যতার নমুনা হলো তিনি সুউচ্চ মর্যাদা দান করলেও সেটাকে বড় মনে করেন না বরং বদান্যতার প্রমাণস্বরূপ দিয়ে চলেন। এমন সুবিশাল বদান্যতা দেখে অনেকের বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না। অনেকে হতবাক হয়ে যায়।

ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন, তার গর্ভের সন্তানকে বাইতুল মাকদিসের খাদেম বানাবেন। তিনি ভেবেছিলেন সন্তানটা ছেলে হবে, কিন্তু মেয়ে সন্তান জন্ম নিল! নারীরা তো পুরুষদের মতো নয়, তবু আল্লাহ তার মানত গ্রহণ করে নেন। তারপর কী হয়েছিল?

আল্লাহ তাআলা ইমরানের স্ত্রীকে নেককার বিনয়ী আল্লাহওয়ালি নারী মারইয়াম আলাইহিস সালাম দান করেছিলেন। তিনি জমিনের বুকে সবচেয়ে ইবাদতগুজার নারীদের একজন। সামান্য যে কয়েকজন নারী পূর্ণ নারী হতে পেরেছেন, তাদের একজন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বদান্যতা দিয়ে সেই নারীকে সবচেয়ে মহান মানুষদের একজনের মা করে দেন। দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫ জন মানুষের একজন, ঈসা আলাইহিস সালামের মা বানিয়েছেন মারইয়ামকে। ইমরানের স্ত্রীর মাথায় কি কখনো এসেছিল যে, তার মানতের জবাব এতটা বদান্যতার সাথে দেওয়া হবে?

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিমের কাছে ওহি পাঠালেন—

...إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا... ﴿١٢٤﴾

আমি আপনাকে মানুষদের ইমাম বানাব।[১]

তারপর তাকে ইমাম বানালেন। শুধু তা-ই নয় বরং কাবাঘর নির্মাণের সময় তার দাঁড়ানোর জায়গাটা আল্লাহর নির্দেশে এক পবিত্র স্থানে পরিণত হলো।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৪

ইসমাইল বড় হয়ে যাওয়ার পরও তাকে সন্তান দিলেন। প্রথমে ইসহাক এবং পরে ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবকে তিনি দিলেন। তারপর বলে দিলেন—

...وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

আমি উভয়কে নবি বানিয়েছি।[১]

যখনই তাঁর বন্ধু সন্তান চাইলেন, তখনই তাকে তিনি বদান্যতাস্বরূপ সন্তান দিলেন। কিন্তু সেই বদান্যতা ছাপিয়ে সন্তানকে নবুয়ত দান করলেন, সন্তানের ঔরসে জন্মানো সন্তানকেও নবি বানালেন। এমনকি সেই সন্তানের সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ তাআলা নবি করে দিলেন!

তাঁর বদান্যতার নিদর্শন হলো তিনি স্বল্পের প্রতিদানে অনেক বেশি দিয়ে থাকেন। স্বল্প কাজ যদি শুদ্ধ ও সঠিক হয়, তবু বিপুল পরিমাণ নেকি দান করেন!

বনি ইসরাইলের এক মহিলা একটা কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করান, যার বিস্তৃতি আসমান থেকে জমিনের সমান বিস্তৃত!

আসমান-জমিন বিস্তৃত জান্নাতের সাথে আপনি একটা কুকুরকে পান করানো পানির তুলনা করুন। সামান্য একটা কাজের বিপরীতে এমন বদান্যতা 'সুমহান দাতা' তথা ওয়াহহাবের দ্বারাই হতে পারে, যিনি বিনা হিসাবে দান করে চলেন!

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৪৯

আল-হক

যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাঁর সাথে কুফরি করে, তাদের জন্য রাতটা কষ্টের! কারণ রাতের নিস্তব্ধতা ও নিঃশব্দতায় নাস্তিকতার শোরগোল নিশ্চুপ হয়ে যায়। যে মানুষটা দিনের বেলা এই মহান রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তার ভেতরে রাতের বেলা আল্লাহর নিদর্শনগুলো এসে ধরা দিতে থাকে!

সুস্পষ্ট সত্য

আল্লাহর নামগুলোর মাঝে অন্যতম হলো আল-হক তথা সুস্পষ্ট সত্য। তিনি এমন সত্য, যে তাঁর অস্তিত্বের বাহিরে অন্য অস্তিত্ব মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি সুস্পষ্ট, তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো তর্ক নেই। কেবল যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি অন্ধত্ব বরণ করেছে, সে-ই আল্লাহর মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করতে পারে।

সবকিছুর মাঝে তাঁর নিদর্শন আছে। সকল সৃষ্টিতে তাঁর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর নিদর্শনগুলো শেষ হয় না। তাঁর প্রমাণগুলো ফুরিয়ে যায় না।

একজন বান্দা তার জীবনে যেখানেই নজর দেবে, স্রষ্টার কোনো না কোনো প্রমাণ সে দেখতে পাবে। সৃষ্টিকুলে যত ক্ষীণ আওয়াজ সে শুনতে পায়, সব তাঁর তাওহিদের সাক্ষ্য দেয়। জগতে যত নড়াচড়া, সব তাঁর রহমতের চিহ্ন! কারণ তিনি সুস্পষ্ট সত্য, আর তিনি ছাড়া সব মিথ্যা ও বিভ্রান্তি।

লক্ষ্য করো

এই বিশ্বজগতে রবের মতো সুস্পষ্ট কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি আপনার চারপাশে

সবকিছুর মাঝেই এমন নিদর্শন পাবেন যেটা তাঁর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আবু নুআস সত্যই বলেছেন—

সবকিছুর মাঝে রয়েছে একেক নিদর্শন

যা প্রমাণ করে দেয় তিনিই অদ্বিতীয় একজন!

সুরা ইউনুসের একটা আয়াত আমাকে সবসময় মুগ্ধ করে। আমি দীর্ঘক্ষণ সেটাতে থেমে থাকি। মুশরিকরা যখন আল্লাহর কাছে নিদর্শন চাইছিল, তখন তিনি জবাবে তাদেরকে বলেন—

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴿١٠١﴾

.....

বলুন, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো।[১]

.....

আসুন আমরা সুরাটির শুরুর দিকে ২০ নম্বর আয়াতে ফিরে যাই। আল্লাহ তাআলা সেখানে বলেন—

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ... ﴿٢٠﴾

.....

আর তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাজিল হয় না কেন?[২]

.....

তারা ঈমান আনার জন্য মাত্র একটা নিদর্শন চায়, শুধু এটা পেলেই তারা ঈমানের ঘোষণা দেবে!

আমাদের চারপাশে বহু নিদর্শন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের শুধু দরকার গভীর দৃষ্টি, যাতে আমরা চমকে যাই! নিদর্শন নানা প্রকারের ও বিভিন্ন কিসিমের হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ বলেছেন, 'আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে'। যেন প্রতিটা মানুষ তার চারপাশে থাকা নিদর্শনগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে। তার বিবেক-বুদ্ধি সেগুলোকে বুঝবে, সেগুলোর মাঝে আল্লাহর মাহাত্ম্য খুঁজে পাবে। তাহির ইবনু

---

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ১০১

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ২০

আশুর বলেন, 'আসমান-জমিনে যা আছে, ব্যাপকভাবে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকের আত্মা সবচেয়ে কাছের জিনিসটা দেখে, যে নিদর্শনের থেকে প্রমাণ দেওয়া সবচেয়ে সহজ সেটা বেছে নেয়।'[১]

শুধু আপনাদের চারপাশে লক্ষ্য করুন। প্রতিটি জিনিস তাঁর নিদর্শন, তাঁর দিকে ইঙ্গিত দেয় এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ। আপনারা কোন ধরনের নিদর্শন চান? আপনারাই তো তাঁর একটা নিদর্শন, তাঁর প্রমাণের অংশবিশেষ।

আল্লাহর স্পষ্টতার আরেকটা নমুনা হলো তাকে যারা অস্বীকার করে, তাদের মুখেও আল্লাহর স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটে! যদিও তারা মনের গভীরে তাকে দাফন করে রাখতে চায়। আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে বিদ্যমান এই বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করে বলেন—

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا... ﴿١٤﴾

.....

আর তারা অন্যায় ও অহংকারবশত সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল, অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল।[২]

.....

তাদের হৃদয়ের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তারা কুফরি এবং আল্লাহর প্রতি বিমুখতার আবরণ দিয়ে সেই বিশ্বাসকে ঢেকে রেখেছে। পীড়াদায়ক প্রশ্নটা হলো, কী সেই জিনিস, যেটা তাদেরকে রব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, অথচ তিনি অতি স্নেহশীল? তাঁর অস্তিত্ব স্বীকারে কী বাধা দিয়েছে, অথচ তিনি সবচেয়ে বড়? তার সাথে একগুঁয়েমি করতে কী প্রভাবিত করেছে, অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত?

নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার একটা বইয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেছে, 'তখনই আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ কীভাবে চিন্তা করে', আল্লাহর ব্যাপারে কী নিকৃষ্ট বাক্য-চয়ন! কিন্তু দেখুন এমন নাস্তিকের মুখ থেকেও কীভাবে সুস্পষ্ট সত্য আল্লাহর কথা বেরিয়ে এলো, যার অস্তিত্ব সে আসলে নাকচ করে। এটা পড়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন, তারা না চাইলেও তাদের হৃৎস্পন্দন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়!

---

[১] *আত-তাহরির ওয়াত-তানওয়ির*, ইবনু আশুর, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৯৫

[২] সুরা নামল, আয়াত : ১৪

নাস্তিক স্টিফেন ওয়াইনবার্গ আল্লাহর 'আল-মুবিন' নামের প্রভাবটা দেখতে পায়। তাই সে তার *Dreams of a Final Theory* বইতে বলে, 'কিছু মানুষ স্রষ্টার ব্যাপারে এতটাই অভ্যস্ত যে, তারা যে কোনো কিছুতে অনুসন্ধান চালালে তাকে খুঁজে পায়।'

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া এমন একটা বিষয় যেটা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতে নারাজ লোকেরাও স্বীকার করে! আল্লাহর অস্তিত্বের চাইতেও সেটা আরও বেশি স্পষ্ট! আল্লাহর ব্যাপারে এত প্রমাণ দেখে তারা বিরক্ত হয়। তাই রবকে অস্বীকার করে তারা যে বইগুলো লেখে সেগুলো শুধু বেড়েই চলে, শেষ হয় না। কারণ সবকিছুতেই প্রমাণ আছে, তিনি একজন ইলাহ।

প্রসিদ্ধ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এ যুগের অন্যতম নাস্তিক বিজ্ঞানী। তার বহু রচনায় 'আল্লাহ' শব্দটি খুব বেশি পরিমাণে আসে। তার অনুসরণে তার ছাত্ররা নাস্তিকতার অঙ্গনে 'আল্লাহ' শব্দটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে। তাই তারা এর নাম দিয়েছে 'আইনস্টাইনের ধর্ম'। রিচার্ড ডকিন্স তার *The God Delusion* বইয়ে এই লজ্জাজনক পরিস্থিতি আলোচনায় এনেছে। অর্থাৎ নাস্তিকদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে বিশ্বাসের ছাপ ধরা পড়ার বিষয়টা। ডকিন্স বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করে বোঝানোর চেষ্টা করতে চেয়েছে যে, এটা কোনোভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব নাকচ করার নাস্তিক্যবাদী নিয়মকানুনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না।

শয়তানটা ভুলে গেছে যে আল্লাহর অন্যতম নাম ও গুণ হলো তিনি 'সুস্পষ্ট'। তিনি জীবনের প্রতিটি প্রান্তে প্রকাশ পান। জগতের প্রতিটি বিশদ পরিস্থিতিতে তাকে দেখা যায়। জীবিত সকল সৃষ্টির নিঃশ্বাসে তার অস্তিত্ব পরিদৃশ্যমান। এমনকি যারা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারাও নিজেদের অস্তিত্বের মাঝে তাকে দেখে!

রাতের বেলায়

একজন বলেছিল, 'রাতের বেলা একজন একগুঁয়ে নাস্তিকও আধা-বিশ্বাসীতে পরিণত হয়।'

যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাঁর সাথে কুফরি করে, তাদের জন্য রাতটা বড় কষ্টের! কারণ রাতের নিস্তব্ধতা ও নিঃশব্দতায় নাস্তিকতার শোরগোল নিশ্চুপ হয়ে যায়। যে মানুষটা দিনের বেলা এই মহান রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাঁর ভেতরে রাতের বেলা আল্লাহর নিদর্শনগুলো ধরা দিতে থাকে!

আল-লামুত্তামি বইয়ের প্রণেতা বলেন, 'এখন রাত তিনটা। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে একটা প্রবন্ধ লেখা শেষ করলাম। কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার সময় লাইটটা বন্ধ করতে পারলাম না। আমার আশঙ্কা হতে লাগল, এটার জন্য আল্লাহ

আমাকে কি শাস্তি দেবেন!'

তিনি এতই বড় যে তাকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি এত স্পষ্ট যে আপনার চোখের আড়ালে যাবে না। আপনি যখন তাঁর অস্তিত্বের বিপক্ষে কিছু যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করাচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন সেগুলো 'যৌক্তিক' তখন তিনি আপনার সামনে আরও স্পষ্ট এবং সুদৃঢ় প্রমাণ পেশ করছেন!

রাতের বেলা আপনি যখন বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন, তখন বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে আপনার হৃদয়ের গভীরে অতি সন্তর্পণে যে ভীতি ঢুকে যায়, সেটা প্রমাণ দেয় যে, আপনার হৃদয়ে যিনি এমন ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তিনি এতটুকু শঙ্কা বা ভীতি দিয়ে আপনার অহংকারকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছেন, যাতে আপনি তাঁর ওপর ঈমান আনেন!

তুমি নিশ্চয় জানো

মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনকে বললেন—

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴿١٠٢﴾

তুমি নিশ্চয় জানো, এই সবকিছু অবতীর্ণ করেছেন আসমান-জমিনের রবই।[১]

তুমি নিশ্চয় জানো। তোমার আত্মা সেটা জানান দেয়। তুমি যে নিজেকে 'সর্বোচ্চ প্রভু' (আর-রাব্বুল আ'লা) দাবি করো, সে দাবিকে তোমার মনের গভীরে থাকা বহু বিষয় নাকচ করে দেয়!

যেমনটা আল্লাহ বললেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ... ﴿٥٦﴾

তাদের অন্তরে এমন অহংকার আছে যে, তারা এ ব্যাপারে সফল হবে না।[২]

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ১০২

[২] সুরা গাফির, আয়াত : ৫৬

অহংকার ঈমানের চারা গাছকে অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই মাটি থেকে উপড়ে ফেলে। বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এই জগতে দিনে-রাতে যে অগণিত নিদর্শন ধরা পড়ে, সেগুলোকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। হঠকারি ও ছোট মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের হৃদয়ে ঈমানের চারা গজানোর আগেই তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে অহংকার।

আইনস্টাইন একবার বলেন, 'আমরা যা জানি, আর যা অনুভব করি, তার পেছনে এমন কিছু আছে যা আমরা বুঝতে পারি না। সেই জিনিসটা তার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য দিয়ে আমাদেরকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে!' কী সেই জিনিস যেটা আইনস্টাইন মনের গভীরে অনুভব করেও প্রকাশ করতে পারেন না?

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا...﴿١٤﴾

আর তারা অন্যায় ও অহংকারবশত সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল, অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল।[১]

প্রকৃতি! প্রকৃতি!

অনেক আগে শুনেছিলাম এক লোক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু তাকে দেখে আমি খুব অবাক হলাম, কারণ সে কোনো কিছুর ব্যাপারে জোর দিয়ে বলতে গেলে আল্লাহর নামেই আবার শপথ করে! সে যেন বলতে চায়, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই!'

কবি হাফিয ইবরাহিম একবার তার নাস্তিক সতীর্থ মিশেল শিবলির সাথে এক কাব্যসন্ধ্যায় গিয়েছিলেন। জনগণের কাছে যখনই কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি পছন্দ হচ্ছিল, তখন তারা বলছিল, 'আল্লাহ, আল্লাহ!' হাফিয তখন মিশেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তুমি? তুমি কী বলবে? প্রকৃতি, প্রকৃতি?'

যে লোকটা সুস্পষ্ট সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাকে স্বাভাবিক আচরণে এবং স্বতঃস্ফূর্ত কাজে অনেক সংকটে পড়তে হয়।

ইস্তাম্বুলে একবার প্রবল তুফান দেখা দিলো। লোহা, কাঠ আর মানুষ এদিক-সেদিক ছিটে পড়ছে। ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা সবার মনে আশঙ্কা! এক সেতুর সামনে একজন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পার হওয়ার সাহস করছে না। যে

[১] সুরা নামল, আয়াত : ১৪

প্রকৃতির পূজা সে করত, সেটাই তার সামনে গর্জন করছে। কুফরি ও একগুঁয়েমি নিয়ে সে সেতুতে উঠে পড়ল। প্রবল শক্তিধর এবং প্রতাপশালীর ক্ষমতার সাথে সে টক্কর দিতে গেল। সুস্পষ্ট সত্যের দলিল-প্রমাণের মুখোমুখি হলো। মনের ভেতর অহংবোধ পুষে রেখে সে ভীতি-আশঙ্কার মোকাবেলা করতে গেল। সেতুর মাঝামাঝি পৌঁছে সে নাস্তিকতার পোশাক খুলে ঈমানের পোশাক পরল। এরপর বলল, 'আমি নাস্তিক হয়ে সেতুর ওপর উঠেছিলাম, মুমিন হয়ে বেরিয়ে এলাম!'

মুমিন হয়ে সে বের হলো, কারণ আল্লাহ সুস্পষ্ট সত্য!

লরেন্স ব্রাউন একজন নাস্তিক ডাক্তার। একবার তার মেয়ে একটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এই রোগের কারণে তার শরীরের চামড়া নীল হয়ে যেত। কারণ সারা দেহে অক্সিজেন পৌঁছত না। হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে লরেন্স মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সে জানত ডাক্তারদের কাছে এর কোনো চিকিৎসা নেই। এই রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত! লরেন্সের ভাষ্যমতে, সে ডাক্তারদের কাছে নিজের মেয়েকে আইসিইউতে দিয়ে হাসপাতালের কোনো এক রুমে চলে গেল। বিশ্বজগতের যে স্রষ্টার অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না, তাকে কল্পনা করতে লাগল।

১৫ মিনিট কেটে গেল। সে মনে মনে নিশ্চিত যে, ফিরে গেলে মেয়ের লাশ পাবে। খুবই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ছিল। যদিও সে আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবু আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টা আইসিইউতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল। কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলল, 'হে স্রষ্টা! তুমি যদি আসলেই থেকে থাকো, তাহলে আমার মেয়েকে সুস্থ করে দাও।' কথাগুলো বলার সময় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এর কোনো চিকিৎসা নেই। সে নিজেও চিকিৎসক, তাই জানত যে চিকিৎসার মাধ্যমে মেয়ে সুস্থ হবে না।

তার ভাষায়, আমি বেরিয়ে দেখলাম ডাক্তাররা অবাক হয়ে কী যেন বলাবলি করছে। আমি তাদের দিকে তাকালাম। তারপর দেখতে পেলাম আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে বসে আছে। বড় মাপের একজন ডাক্তার তার সুস্থ হওয়ার বিভিন্ন কারণ বলছিল, কিন্তু আমি একজন ডাক্তার হয়েও বুঝতে পারছিলাম, সেই ডাক্তারটি সত্য কথাটা বলছে না!

নাস্তিকতা নিয়ে সে হাসপাতালে ঢুকেছিল, বিশ্বাস নিয়েই সে বের হলো!

...وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

তারা জানে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। [সুরা নুর, আয়াত : ২৫]

আল-হাকিম

হিকমাহ তথা প্রজ্ঞা হলো কোনো কিছু যথাস্থানে রাখা। যিনি সকল কিছু যথাযথ স্থানে রাখেন, তিনি প্রজ্ঞাবান সত্তা। প্রজ্ঞাময় তথা আল-হাকিম তাঁর অন্যতম গুণ। এটা তাঁর সুন্দর নামসমূহের একটি। তিনি প্রবল প্রজ্ঞার অধিকারী। সৃষ্টির নানান ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞার রহস্যময় দিকগুলো প্রকাশ পায়। আবার অনেক প্রজ্ঞার দিক তিনি গোপন রাখেন। যারা তাঁর প্রজ্ঞার রহস্য নিয়ে চিন্তা করে, তাদেরকে তিনি বিশেষভাবে কিছু প্রদান করেন। এতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সম্মান বেড়ে যায়।

আল্লাহর 'আল-হাকিম' নামে এটা এক ঈমানি সফর। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর সৃষ্টিকুল, তাঁর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছায় নিহিত প্রজ্ঞার দিকগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

তোমাদের আপন সত্তায়

ত্রিশের চেয়ে বেশি বছর আগে একজনের মজলিসে বসেছিলাম। তখন আমি ছোট। তবে এখনো তার বলা সেই অনন্য ঈমানি বক্তব্য আমার টাটকা মনে আছে। তিনি তার দেশের এক দাঈর থেকে এই শিক্ষাটা বর্ণনা করেন। আল্লাহ উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ সুরা যারিয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন—

وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

তোমাদের আপন সত্তায়, তোমরা কি দেখছ না? [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ২১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বান্দাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা মেনে তিনি সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহর নিহিত প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেন। মানুষের হাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর একটা জিনিস তিনি তুলে ধরেন। তারপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, হাতের উপরিভাগে যে চামড়া রয়েছে সেটা সাধারণত নরম হয়। আর হাতের তালুর চামড়া কিছুটা শক্ত হয়। এর মাঝে নিহিত গূঢ় রহস্য হলো, যদি ওপরের চামড়া নিচে থাকত তাহলে আমাদের জন্য কিছু হাতে ধরা কঠিন হয়ে যেত। কারণ ওপরের চামড়া এত নরম যে এটা গরম অনেক কিছু সহ্য করতে পারত না। এটা কোমল হওয়ার কারণে এটা দিয়ে আমরা জিনিসপত্র হাতে ধরতে পারতাম না। আর নিচের চামড়া যদি ওপরে থাকত, তাহলে হাত শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা মুষ্ঠিবন্ধ করতে পারতাম না!

দিনে শতবার আমরা যে জিনিসটা দেখি, সেটার মাঝে থাকা এক ক্ষুদ্র শিক্ষণীয় দিক। তবু আমরা এতে আল্লাহর নিহিত প্রজ্ঞা যেন দেখতে পাই না। সুবহানাল খাল্লাকিল আলিম! (মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী আল্লাহ কত মহান!)

আয়না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

...أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

শুনে রেখো, সৃষ্টি ও হুকুম তাঁরই।[১]

সৃষ্টি ও হুকুম এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিতে প্রজ্ঞা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

আপনি তাঁর সৃষ্টিকুলের দিকে তাকান, তারপর তাঁর নির্দেশ ও শরিয়ত পর্যবেক্ষণ করুন, তাঁর প্রজ্ঞা, মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের সামনে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকবেন।

সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করে এমন কিছু উৎস বা সূত্রে গিয়ে আমি কোষের বিস্ময়কর দিক কিংবা পরমাণুর অভিনব বিবরণ দিতে পারব। কিন্তু প্রিয় পাঠক! আপনি প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যা দেখেন তা নিয়ে আসুন। আপনার জীবনে যে জিনিসগুলো দেখতে পান, যেগুলোর জন্য আপনার পরীক্ষাগার বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন নেই, সেগুলো নিয়েই বরং গবেষণা করুন।

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৪

আপনার কানদুটি নিয়ে আমাকে বলুন তো। কেন এভাবে বেরিয়ে থাকে? কেন আল্লাহ মাথার দুই পাশে দুটি ছিদ্র দিয়ে দিলেন না?

এভাবে কান সৃষ্টি করার মাঝে আল্লাহর নিহিত প্রজ্ঞা কী? বিষয়টা জানতে হলে আপনার কানে পানি ঢুকলে যে তীব্র যন্ত্রণা হয় সেটার অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে হবে! তাহলে আপনি জানতে পারবেন আল্লাহ এই সূক্ষ্ম গঠনের মাধ্যমে আপনার কানের ভেতরের অংশে পানি প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা দিয়ে রেখেছেন। তিনি এভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যেন আপনি প্রতিবার গোসল করার পর তীব্র বেদনা নিয়ে রাত কাটাতে না হয়!

আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান। আপনার শরীরে এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়-গোড় বা আকৃতি পাবেন না, যেটার উপকারিতা নেই। আপনি যদি কিছু না জেনেও থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে এর মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

আমি তাদেরকে (পৃথিবীর) দিক-দিগন্তে ও তাদের নিজেদের মাঝে নিদর্শনগুলো দেখাব, যাতে এই কুরআন যে সত্য তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তোমার রবের ব্যাপারে কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তিনি সবকিছুর একজন সাক্ষী?[১]

নাকের ডগার দুটি ভাগ। ওপরের ভাগটা শক্ত, আর নিচের ভাগটা মসৃণ। আপনার নাক যদি ওপর থেকেই মসৃণ হতো, তাহলে কী অবস্থা হতো? মাঝে মাঝে হঠাৎ নাকের এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিলে যাওয়ায় আপনার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেত! আবার নিচ দিয়ে যদি নরম হতো, তাহলে আপনি নিঃশ্বাস নিতে এবং ছাড়তে গিয়ে কেমন প্রতিকূলতা অনুভব করতেন!

চোখের ভ্রুর কথাই ভাবুন। ওপর থেকে যে পানি বা ধুলোময়লা পড়ে, সেটা থেকে কীভাবে চোখকে রক্ষা করে চলেছে এই ভ্রু? আপনার চোখের পশমের বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম কথা বলা যাবে! আপনার চোখের পাতার ব্যাপারে এর চাইতে আরও

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৫৩

গভীর কথা বলা যাবে! আল্লাহর প্রজ্ঞা এত গভীর যে তিনি চোখ নামে আপনার এই সংবেদনশীল প্রত্যঙ্গ রক্ষার জন্য তিন-তিন জন পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। তারা এই চোখের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করছে।

আল্লাহর প্রজ্ঞা বুঝতে হলে আপনাকে শুধু ভেবে যেতে হবে। ভাবুন তো আপনার শরীরে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার কী নিদর্শনগুলো রেখে গিয়েছেন! আপনার শরীরই এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, এক অনবদ্য চিত্র!

আপনি দাবি করছেন আপনি এক ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু আপনার মাঝেই রয়েছে বিশ্বজগৎ!

তাঁর হুকুম

আল্লাহর প্রজ্ঞা যেমন তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে প্রকাশ পায় তাঁর হুকুমে। তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন যেটা দাসত্বের চাহিদার সাথে মেলে, যেটা সৃষ্টিকুলের কল্যাণ নিশ্চিত করে, যেটা দুনিয়া-আখিরাতের সৌভাগ্য অনিবার্য করে দেয়।

আল্লাহ কেন সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা যদি ভাবেন, তাহলে আপনি ভাবনায় হারিয়ে যাবেন। কারণ এই সালাতে রয়েছে বহুবিধ প্রজ্ঞা আর অগণিত গূঢ় রহস্য।

সালাতের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সালাত পাঁচটি। এর থেকে বেশি পরিমাণ দেওয়া হয়নি যাতে বান্দাদের জন্য সালাত আদায় কষ্টকর না হয়। আবার কমও করা হয়নি যাতে বান্দার হৃদয়ে বন্দেগির অনুভূতি কমে না যায়, যে বন্দেগিই তাদেরকে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য!

সালাত পড়ার নিয়ম, ওঠাবসার মাঝে থাকা আধ্যাত্মিকতা, জিকিরের মাঝে থাকা ঈমানি অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করলে আপনি দেখবেন প্রজ্ঞায় ঢাকা সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও মর্যাদায় আবৃত প্রজ্ঞা!

সালাত থেকে সাওমে গেলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। ক্ষুধা আপনাকে দরিদ্র ব্যক্তির অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুধার দুর্বলতা আপনাকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বিমুখ করে তোলে। আল্লাহর নির্দেশের প্রতি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মসমর্পণ আপনার মাঝে বন্দেগির প্রকৃত অর্থ জাগিয়ে তোলে!

হজের ইবাদতগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখুন। তাহলে দেখতে পাবেন আল্লাহর নির্দেশে গৃহীত কিছু পদক্ষেপের সমষ্টি। হজ মানুষদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে,

তারা এক মহান প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার বান্দা।

সৃষ্টিতে আল্লাহর যেমন প্রজ্ঞা, তেমনই প্রজ্ঞা তাঁর হুকুমে ও শরিয়তে। জগতের প্রতিটি জিনিসে রয়েছে স্রষ্টার প্রজ্ঞার নমুনা।

দুই নারীর সমান অংশ

সম্পত্তি বণ্টনের এক বিষয়ে কেউ একজন আপত্তি করে বসল। আপত্তিটা ছিল— যদি ওয়ারিশদের মাঝে ছেলে-মেয়ে এবং ভাই-বোন থাকে, তাহলে তাদের মাঝে বণ্টনটা হবে—

...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... ﴿١١﴾

পুরুষের জন্য দুই নারীর সমান অংশ।[১]

আপত্তিকারীর দৃষ্টিতে এর মাধ্যমে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে!

আলিমরা তার আপত্তির খণ্ডন এমনভাবে করে দিয়েছে, যে সে চুপ মেরে যেতে বাধ্য হয়েছে!

পুরুষ যদিও এখানে দ্বিগুণ নিয়েছে, তবু তাকে ভরণ-পোষণ দিতে হয়। আর নারী অর্ধেক পায় বটে, কিন্তু তার ওপর কারও জন্য খরচ করার বাধ্যবাধকতা নেই। তার সম্পদ কেবল তারই, আর পুরুষের সম্পদ নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও। সম্পত্তিকে এভাবে বণ্টনের মাঝে এটাই নিহিত প্রজ্ঞা!

আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্যতম দিক হলো তিনি কিছু শারয়ি বিধানে রহস্য ও গূঢ়তা রেখে দিয়েছেন। এই বিধানগুলো বান্দাদের জন্য পরীক্ষা। এগুলোর মাধ্যমে মুমিন মুনাফিক থেকে আলাদা হয়। মুসলিম সংশয়বাদী থেকে পৃথক হয়। আল্লাহর সামনে অবনত ব্যক্তি এবং আল্লাহর থেকে বিমুখ ব্যক্তি আলাদা হয়ে যায়! তাঁর সব শরিয়তের প্রজ্ঞা সবার সামনে সুস্পষ্ট না। এতে করে তাঁর বান্দাদের মাঝে তারতম্য হয়। তাদের মাঝে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানে স্তরভেদ হয়। এমনকি কুফর ও পাপাচারের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেন এবং নির্দেশনা প্রদান করে, সবকিছুতে রয়েছে তার গভীর প্রজ্ঞা!

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১

কিছু শারয়ি বিধানে থাকা এমন উহ্য প্রজ্ঞার কারণে কোনো কোনো আলিম পরীক্ষায় পড়েন। তারা এ সমস্ত শারয়ি বিধানে আল্লাহর নিহিত প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করেন। এটাও তাদের জন্য জিহাদ। এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়, দুর্বল অন্তরগুলো শক্তিশালী হয় এবং তারা আল্লাহর কাছে সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করেন।

স্রষ্টার প্রজ্ঞা

এক কবি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে আপত্তি করে ভয়াবহ একটা কথা বলে বসে। তার কথাটা ছিল—

এক কবি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে আপত্তি করে ভয়াবহ একটা কথা বলে বসে। তার কথাটা ছিল—

'যে হাতের রক্তপণ হিসেবে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হলো, সেটাই আবার এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রার কারণে কেন কাটা হলো?

এমন স্ববিরোধিতা দেখে আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। আমাদেরকে শুধু মাওলার কাছে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চেয়ে যেতে হবে।'

অর্থাৎ তার কথা হলো, এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা চুরি করার জন্য মানুষের হাত কাটা কীভাবে বৈধ হতে পারে, যেখানে হাত কাটার রক্তপণ এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা!

মূলত শয়তান এভাবে সংশয়ের জাল বুনে নিজের অনুসারীদের মুখে মুখে সেটাকে ছড়িয়ে দেয়।

এক বিচক্ষণ আলিম তার উত্তরে বলেন, 'আমানতদারের হাত হওয়ায় সেটা দামি ছিল! কিন্তু খেয়ানতকারীর হাত হওয়ায় দাম সামান্য হয়ে গেল!'

আবু আব্দিল ওয়াহহাব মালিকি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কবির কথার জবাবে বলেন—

'সংশয় দিয়ে শরিয়তের ব্যাপারে আপত্তি তুলো না। দ্বীনের নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে কবিতা দিয়ে আপত্তি করা যায় না। আমানতদারিতার মর্যাদা হাতকে দামি করে তুলেছে, আর হাতের মূল্য কমিয়ে দিয়েছে খেয়ানতের লাঞ্ছনা। স্রষ্টার প্রজ্ঞাটুকু বুঝে নাও।'

আল্লাহ খেলেন না

নাস্তিক গণিতবিদ আইনস্টাইন বছরের পর বছর বিশ্বজগৎ পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্রষ্টার প্রতি বিনত হয়ে বলেছিল, 'স্রষ্টা

পাশা খেলেন না!' তিনি এক প্রসিদ্ধ নাস্তিক। কিন্তু বিশ্বজগতের এমন সুগঠিত নিয়মকানুন আর সূক্ষ্ম পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে আইনস্টাইন বেশ গভীরভাবে জানতেন, তাই তিনি এমন মন্তব্য করেন।

কুরআন কারিমেও কাছাকাছি বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾

আমি আসমান-জমিন এবং এই দুইয়ের মাঝে থাকা সকল কিছু খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১৬]

বিষয়টা খেল-তামাশার নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষজন, সৌরজগৎ, নক্ষত্র, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি, রক্তকণিকা, ইলেক্ট্রন, সমুদ্র, গাছপালা, আগ্নেয়গিরি, আলো, শব্দ, অনুভূতি এত সবকিছু এমনি এমনি কিংবা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি! বরং প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পেছনে তাঁর রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

আমাকে জানান

একটি বিষয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেটা হলো বান্দার দুআয় সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিলম্ব করা। আল্লাহ তৎক্ষণাৎ বান্দার চাওয়া পূরণ করে দিতে পারেন। আপনি হাত ওঠালেই আল্লাহ আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞার দাবি হলো, বহু দুআর ক্ষেত্রে এমনটা হবে না!

এই বিষয়টার মাঝে গূঢ় রহস্য কী হতে পারে, সেটা কি আমি আপনাকে বলব? চলুন আমরা ঐ দরিদ্র বান্দার কাছে চলে যাই, যে বান্দা প্রত্যেক সালাতের পর হাত তুলে আল্লাহর কাছে রিজিকের প্রবৃদ্ধি চায়। কিন্তু তবু তার রিজিকে প্রশস্ততা আসেনি। চলুন, আমরা এর রহস্য উদঘাটন করি।

যে মানুষটা দাসত্বের মেহরাবে প্রতিনিয়ত কেঁদে চলে, তার ব্যাপারে আমাকে জানান। আপনি জানেন আল্লাহ তার কাছ থেকে এই দুআগুলো শুনতে পছন্দ করেন। কারণ তিনি বান্দাদের সৃষ্টিই করেছেন তার ইবাদতের জন্য। আপনি জানেন দুআ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বান্দার জীবন কখনো দুআ থেকে ফারেগ হতে পারে না। তার জীবনে এমন সব পরিস্থিতি তৈরি হবে যে, সে আল্লাহর কাছে দুআ করতে বাধ্য থাকবে—এটা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। কারণ তখন বান্দা দাসত্বের পোশাক

পরিধান করে, ফলে রবের দান পাওয়ার উপযুক্ত হয়।

সেজন্য এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, 'দুর্ভাবনার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিংবা প্রশস্ত দুনিয়াটা সংকীর্ণ হয়ে গেলে ভেঙে পড়বেন না। হয়তো আল্লাহ শুনতে চাইছেন, আপনি তাকে ডাকছেন!'

যে বান্দার ওপর সব দিক থেকে রহমত ও সন্তুষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, তার জন্য এমন দারিদ্র্যের কীই বা ক্ষতি? সাথে আখিরাতের উত্তম বদলা তো আছেই! এটা গেল একটা উদাহরণ।

তারপর আমাকে জানান এমন দরিদ্র বান্দার কথা যে আল্লাহর কাছে ধনী হওয়ার জন্য দুআ করেছিল, আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ জানতেন প্রাচুর্য এই লোকটাকে বিচ্যুতির গভীরে নিক্ষেপ করবে। লোকটা সীমালঙ্ঘন করবে এবং অহংকার প্রকাশ করবে। তিনি এটাও জানতেন, সে বেঁচে থাকবে আর মাত্র অল্প কয়েকটা বছর। পাঁচ বা দশ বা এর কাছাকাছি। তাহলে তার ব্যালেন্সে লক্ষ লক্ষ টাকা যোগ হয়ে কী লাভ, যেটা তাকে সীমালঙ্ঘন করতে উদ্বুদ্ধ করবে? যেটা তাকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে? আল্লাহর দাসত্ব থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে! সে দুনিয়া-আখিরাত দুইটাই হারাবে? এটা গেল দ্বিতীয় উদাহরণ।

আমাকে এমন দরিদ্র লোকের কথাও জানান যে আল্লাহর কাছে ধনী হতে চায়। আল্লাহ জানেন এই লোকটা ধনী হওয়ার অর্থ শীঘ্রই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া। এমন লোকের জন্য দরিদ্র হওয়াটাই বরং কল্যাণকর। ধনী হলেও খুব দ্রুত কোনো এক দুর্যোগ এসে তাকে দরিদ্র করে দেবে। সুতরাং তার জন্য কিছুটা দেরিতে ধনী হওয়াটা উপযুক্ত। দুর্যোগটুকু কেটে যাওয়ার পর ধনী হলে সেটা তার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী হবে। এটা গেল তৃতীয় উদাহরণ।

এভাবে শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে। আল্লাহর প্রজ্ঞা আপনি যতই পর্যবেক্ষণ করবেন, ততই তার অনুগ্রহ, ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য আপনার সামনে স্পষ্ট হবে। দরিদ্র ব্যক্তির দরিদ্র থাকার মাঝে যেমন প্রজ্ঞা আছে, তেমনিভাবে অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত ও অসহায় ব্যক্তিদের অবস্থা তেমনই রেখে দেওয়ার মাঝে প্রজ্ঞা নিহিত। আপনি মনে করবেন না প্রজ্ঞাময় প্রভুর প্রজ্ঞায় ঘাটতি থাকতে পারে কিংবা দয়াময় আল্লাহর রহমতে কমতি থাকতে পারে।

একজন সাহিত্যিক ছিলেন যার রচনার মাঝে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ পাওয়া যেত। তার একটা কথা উদ্ধৃত করে আমি শেষ করছি। তার এ কথাটা অবশ্য সত্য, 'আল্লাহ

তাঁর বান্দাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা করবেন। সেটা ছাড় দিয়ে বা কঠোরতা আরোপ করে—উভয়ভাবেই হতে পারে। বান্দাদের কাছে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় উভয় প্রক্রিয়ায় তিনি তাদের যাচাই করবেন। প্রত্যেক যুগের জন্যই কল্যাণের রকমফের হয়, পরীক্ষার নানান পদ্ধতি হয় এবং ইবাদতেরও বিভিন্ন ধরন থাকে।'

যথাযথ অনুপাতে

আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্যতম একটি নমুনা হলো তিনি তার সৃষ্টিকুলের সকল কিছু যথাযথ অনুপাতে নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন সীমারেখা দিয়েছেন, যেটা অতিক্রম করার সাধ্য তাঁর সৃষ্টির কারও মাঝে নেই। কতই না মহান সে সত্তা—

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।[১]

আমরা যদি সেই বিস্ময়কর অনুপাতগুলোর বিবরণ দিতে শুরু করি, তাহলে আলোচনা লম্বা হবে। কিন্তু আমরা শুধু শ্রবণশক্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত যথাযথ অনুপাতের প্রসঙ্গ এনে থেমে যাবো!

আমরা জানি মানুষের শ্রবণসীমার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মাত্রা আছে। সর্বনিম্ন মাত্রা থাকার কারণে আপনি খুব ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাবেন না। আর সর্বোচ্চ মাত্রা থাকার কারণে খুবই উচ্চস্বরের আওয়াজও আপনি শুনতে পাবেন না।

চিন্তা করুন তো, যদি আপনি এই দুই ধরনের আওয়াজ শুনতে পেতেন, অর্থাৎ শ্রবণের সীমারেখা অতিরিক্ত হওয়ার কারণে আপনি সামান্য আওয়াজ বা খুব জোরে হওয়া আওয়াজ শুনতে পেতেন, তাহলে কেমন হতো!

বিশ্বাস করুন, আপনার জীবনটা তখন এত সুন্দর হতো না।

আপনার কানে গুঁজে দেওয়ার জন্য অনেক তুলার প্রয়োজন পড়ত যাতে করে

[১] সুরা ফুরকান, আয়াত : ২

আপনি নিরবচ্ছিন্ন বিরক্তিকর শোরগোল থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

আপনার জীবন হয়ে যেত বড় কল-কারখানায় কাজ করা মানুষগুলোর মতো, যারা সারাক্ষণ মেশিনের আওয়াজ, লোহার ঠোকাঠুকি আর বড় বড় কপিকলের ঘষাঘষির শব্দে বিরক্তি হয়ে থাকে।

আপনি শান্তিমতো ঘুমাতে পারতেন না। আপনার থেকে শত শত মাইল দূরে এক শহরে যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেটার আওয়াজে আচমকা আপনার ঘুমটা ভেঙে যেত।

এমনকি আপনার পাশের রুমে যে পিঁপড়া মেঝেতে হেঁটে যাচ্ছে, মশা ডানা ঝাপটাচ্ছে, সেটার আওয়াজ শুনতে পেতেন। আপনার জীবনে নীরবতার কোনো অস্তিত্ব থাকত না।

সকল সৃষ্টির শ্রবণক্ষমতা এক নয়। বহু প্রাণী আছে যেগুলো ভূমিকম্পেরও কয়েকদিন আগে অনুভব করতে পারে! এমনকি কবরে মৃতদের চিৎকারও শুনতে পায়। তাই কবরের আশেপাশে গেলে ভয়ানক আওয়াজ পেয়ে বিভিন্ন পশুকে সরে যেতে দেখবেন। সুতরাং আপনার শ্রবণসীমা কোনো স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করবেন না, যেটা অতিক্রম করা যায় না। বরং আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনার এমন শ্রবণসীমা।

কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রবণসীমা সীমিত করে দেওয়া এক বড় নিয়ামত। গাফেলতির কারণে আমাদের কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমরা ভাবছি, এটা তো খুবই সাধারণ বিষয়। এটা নিয়ে গভীর ভাবনার প্রয়োজন নেই। যিনি এই নিখুঁত জীবন দিয়েছেন, তাঁর প্রশংসা করা তো আমাদের কাছে দূরের ব্যাপার।

সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য হে রব! আপনি সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন আর সকল কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন যথাযথ অনুপাতে।

আলঝেইমার

আল্লাহ প্রায়ই তাঁর কিতাবে বান্দাদের দুর্বলতা দেখিয়ে দেন, যেন তারা তাঁর শক্তিমত্তা জানতে পারে। তাদের অক্ষমতা দেখিয়ে দেন যাতে তারা তাঁর ক্ষমতা বুঝতে পারে, তাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেন, যেন তারা তাঁর প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে পারে।

একদিন আমি এক হোটেলে অর্ডার করার পর খাবার আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক বডিবিল্ডার যুবক হাতে সিগারেট নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল। সে নিজের সাথেই কথা বলছিল। হোটেলের বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকে সে উঁচু গলায় অদৃশ্য কাউকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল। অদ্ভুত

কথোপকথনে তাকে বেশ আবেগী হতে দেখা গেল। আমি নিশ্চিত হলাম, সে একজন পাগল। হোটেল থেকে বের হওয়ার পরও সে ঐ অদৃশ্য মানুষটার সাথে কথা বলেই চলছিল। হোটেলের কর্মচারীদেরকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বেশ দুঃখ নিয়ে বলল, '২ মাস আগেও সে সুস্থ ছিল। তার কোনো সমস্যা ছিল না। তারপর হঠাৎ করে পাগল হয়ে গেল!'

মানুষ এমনই! তবুও সে বিভিন্ন কাজে আল্লাহর প্রজ্ঞা আছে কি না জিজ্ঞেস করে? অমুক বিধান আল্লাহ কেন দিলেন সেগুলো খুঁজে বেড়ায়! নিজের বুদ্ধি-জ্ঞান ধরে রাখার ক্ষমতাই তার নেই, অথচ প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে!

আমার এক আত্মীয় ছিল। তার অনেক বয়স হয়েছিল। সম্ভবত আলঝেইমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। একদিন তাকে সালাম দিতে ঢুকলাম। কিন্তু আগে আমাকে দেখে যেমন খুশি হতেন, তেমন খুশি হলেন না। পাশের কোনো একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কে?' আমার শরীরটা তখন অবশ হয়ে গিয়েছিল। কান্নার অনুভূতিতে গলায় কথা আটকে গিয়েছিল। মানুষ, তুমি কতটা অসহায়!

১০ বছর পরে হঠাৎ এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। এতদিনে তার ওজন অনেক বেড়েছে। এমন মাত্রাতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞেস করার পর তার উত্তর ছিল, 'প্রতিদিন যে ট্যাবলেট খেতে হয়, সেটার কারণে ওজন বেড়ে গিয়েছে।' ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলাম ট্যাবলেট খাওয়ার কারণ। হতাশ গলায় সে উত্তর দিলো, 'আমি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী!'

মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান খুব সংবেদনশীল একটা জিনিস। হ্যাঁ, এই বুদ্ধি দিয়ে সে বিশ্বজগৎকে চিনতে পারে। কিন্তু এটাতে কোনো ছোটখাটো সমস্যা হলে মানুষ আর স্বাভাবিকভাবে বিশ্বকে দেখতে পারে না। বিশ্বের ব্যাপারে নিজস্ব কল্পনা তৈরি করে নেয়। নিজের কল্পনার আলোকে বিশ্বজগৎকে দেখতে শুরু করে। যায়েদের নাম দেয় আমর। গাড়িকে মনে করে উট। কাঁদার মতো বিষয় দেখলেও হাসে।

...ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①

...তারপরও কাফিররা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ স্থাপন করে।[১]

[১][সুরা আনআম, আয়াত : ১

অসহায়!

মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আরও একটা রোগে আক্রান্ত হয়। সেই রোগের নাম ফোবিয়া তথা ভীতি। নানা রকমের ফোবিয়া হতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত কারও কারও অন্ধকারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। কেউ আবার বিল্ডিংয়ে লিফটে উঠলে মনে হয় দুনিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মাথা ঘোরা শুরু হয়, ঘর্মাক্ত হয়, মুখ লাল হয়ে যায় এবং পড়ে যেতে উদ্যত হয়! কী দুর্বল তার আকল! কাল্পনিক অনেক কিছুকে সে অস্তিত্বশীল মনে করে। অনেক অনুভূতি তার মনে জন্মায়, যেগুলোর পেছনে কোনো কারণ নেই। অথচ সে-ই নাকি প্রখর বুদ্ধির অধিকারী মানুষ।

আর ওয়াসওয়াসার কথা বলতে গেলে তো শেষ হবে না। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এই ওয়াসওয়াসা নামক রোগে আক্রান্ত হয়। ইমাম ইবনুল জাওযি *তালবিসু ইবলিস* নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে ওয়াসওয়াসার অদ্ভুত সব ঘটনা তুলে ধরেছেন। কিছু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গোসল করে, কেউ কেউ এক সালাত বারবার পড়ে ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকাকালীন একবার আমার এক বন্ধুকে ফজরের জন্য জাগিয়ে দিই। সে বাথরুমে ঢুকে, এদিকে আমি আযানের সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে ফজরের সুন্নত পড়ে কুরআনের কিছু অংশ পড়ি। তারপর বেশ লম্বা সময় পরে সালাতের ইকামত হয়। সালাতের পর আমি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে থাকি। রুমে ফিরে দেখি আমার বন্ধু এখনো ওজু করছে। তাকে দরজায় নক করলাম। আমি তো ভেবেছিলাম সে মারাই গিয়েছে। সে অবাক হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের সালাত কি শেষ?' অর্থাৎ সময় চলে যাওয়ার বিষয়টা টেরই পায়নি সে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সে বাথরুমে ছিল! মানুষ তার মানসিক রোগের কাছে কতটা অসহায়!

আমার এক মহিলা আত্মীয় একবার সালাতে তার ওয়াসওয়াসার বিষয়টা অভিযোগ করে। আমি ভেবেছিলাম, সে একাধিকবার তাকবির পড়ে কিংবা সুরা ফাতিহা একাধিকবার পড়ে। কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে সে উত্তর দিলো, 'না, আমি এক ওয়াক্ত সালাতই চার থেকে পাঁচ বার পড়ি!'

মানুষের আকলে প্রায়ই সংশয়-সন্দেহ আসে। যেগুলোর কারণে সে অগোছালো নানান কাজ করতে থাকে। কোনো একটা আবশ্যকীয় ফল ধরে নিয়ে সে এই কাজগুলো করে। স্ত্রীকে ফোন দিয়ে যদি ব্যস্ত পায়, তাহলে ধারণা করে বসে, স্ত্রীর সাথে কোনো পরপুরুষের সম্পর্ক আছে! দুজন মানুষকে তার দিকে তাকিয়ে

ফিসফিস করে কথা বলতে দেখলে ভাবে, তার বিরুদ্ধে হয়তো তারা ষড়যন্ত্র করছে!

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তর তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে প্রশ্ন আসে, দৃঢ় প্রত্যয় কী? এটা সত্য জ্ঞান অর্জনের একটা প্রাথমিক পর্যায়। প্রকৃত প্রত্যয়ের তুলনায় এটা কোথায়? আর চাক্ষুষ প্রত্যয়ের তুলনায় প্রকৃত প্রত্যয়ই বা কোথায়? এক ব্যক্তি বলেছিলেন সত্য ষড়ভুজ আকৃতির। আমরা এক একটা অংশ জানি বলে এর বাকি পাঁচটা অংশের অস্তিত্ব নাকচ করে দিতে পারি না। সুতরাং সত্যের একটা অংশ জেনেই আমাদের খুশি হওয়া উচিত নয়। হয়তো সত্যের যে অংশ আমরা জানতে পেরেছি, তার চাইতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশই আমাদের অজানা।

আমাদের যে বিবেক-বুদ্ধি এত এত সমস্যায় পড়ে, এত এত দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়, সেই বিবেক-বুদ্ধি কোনো বিধানে বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রজ্ঞা জিজ্ঞেস করার মতো যোগ্যতাও রাখে না। আমাদের চারপাশে কী ঘটছে সে ব্যাপারে নিরপেক্ষ কিছু অনুধাবন করতে অক্ষম আমাদের বিবেক-বুদ্ধি। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের গূঢ় রহস্য বা প্রজ্ঞা উদঘাটন করা তো দূরের বিষয়!

অতএব আমাদের জন্য প্রজ্ঞাময় সম্যক অবহিত রবের তরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ার সময় কি আসেনি? আমরা কি এখনো বুঝব না যে, আমাদের নানান প্রশ্নের তুলনায় তাঁর প্রজ্ঞা অনেক গভীর। তিনি সর্বোত্তম বিষয়ই নির্ধারণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শরিয়তই প্রণয়ন করেন। তিনি সবচেয়ে কল্যাণকর ফয়সালাই প্রদান করেন।

আল-আলিম

আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের কথা তাঁর কিতাবে শত শত বার এসেছে! হোক সেটা তাঁর নামে কিংবা কাজের বিবরণের মাধ্যমে। যেমন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি গুণের মাঝে নিহিত কাজের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা চান তাঁর সৃষ্টি যেন তাঁর জ্ঞানের ওপর ঈমান আনে, তাঁর ব্যাপারে ভাবে, তাদের কথা-কাজ-বিশ্বাসে যেন আল্লাহর জ্ঞানকে অনুধাবন করে। কারণ আল্লাহর দিকে তাদের যাত্রা ততক্ষণ যথাযথ হবে না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে যে, অস্তিত্ববান সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে আল্লাহর জ্ঞান!

আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপারে কথা বলাটা যেমন প্রশান্তি দেয়, তেমন ভীতির উদ্রেক ঘটায় এবং আমলেও উদ্বুদ্ধ করে। এই মহান নামের অর্থ ও প্রজ্ঞার ছায়াতলে না গেলে অন্তর প্রাণ ফিরে পায় না।

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সবকিছু জানেন। কিন্তু 'সবকিছু' কথাটাতে আমরা মনোযোগ দিই না। কয়েক মিনিটের জন্য 'সবকিছু' শব্দ দুটি নিয়ে ভাবলে আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে যেতাম!

তাহলে আমরা আল-আলিম নামটি বোঝার জন্য ইচ্ছেমতো একটা নাম নিই। আল-আলিম তথা সর্বজ্ঞ আল্লাহর জ্ঞান আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে। সেই নামটা হোক উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ জানতেন যে উমর ইবনুল খাত্তাব নামে একজন মানুষকে তিনি সৃষ্টি করবেন। তার জন্মেরও হাজার বছর আগে তিনি তার নাম, জন্মের বছর এবং জন্মমৃত্যুর মুহূর্তটুকু জানতেন। তিনি যে আদমের

বংশধর হবেন, তার শরীরে কোষের সংখ্যা কত হবে, তিনি জীবনে কতগুলো স্বপ্ন দেখবেন, কবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন, জীবনে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন, জীবনে কী কী জিনিস তিনি দেখবেন, কতগুলো কথা তার কানে আসবে, কতগুলো হরফ তিনি উচ্চারণ করবেন, কতগুলো পদক্ষেপ নেবেন—সব তিনি জানতেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার বংশধর কে কে হবে সেগুলোও আল্লাহ জানতেন। আল্লাহ তাদের সবার সম্পর্কে সবকিছু জানতেন।

উমর সম্পর্কে আল্লাহ যা জানেন, সেটা জগতের বুকে প্রতিটা মানুষ সম্পর্কে তিনি জানেন। বরং জগতের বুকে থাকা সকল কিছুর সম্পর্কেই তিনি এমনটা জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত সত্তা। কোনো কিছু তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যায় না!

তিনি অবশ্যই শুনলেন

স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করতে খাওলা বিনতু সালাবা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন, তখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বাড়িতেই ছিলেন। আয়িশা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন, আবার কিছু তার কানে আসছিল না।

ক্ষণিকের মধ্যে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করলেন—

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

> আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

আমাদের মা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এরপর সবসময় বলতেন, 'সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যার শ্রবণ সকল আওয়াজকে ব্যাপ্ত করে আছে!'[২]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চমকে গেলেন! কয়েক মিটারের দূরত্বের আওয়াজ কীভাবে তিনি শুনতে পারলেন না! অথচ আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে

---

[১] সুরা মুজাদালা, আয়াত : ১

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৩৮৬

আওয়াজ শুনলেন! বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মাসআলাটা সহজ। আমরা সবাই এটা বিশ্বাস করি! কিন্তু যখন বিষয়টা বিস্তারিত আপনার সামনে ঘটে, তখন আপনি বিস্মিত না হয়ে পারেন না। আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, যখন বুঝতে পারেন আপনাকে আল্লাহর জ্ঞান ঘিরে আছে। আপনার প্রতিটি ক্ষীণ আওয়াজ, চিন্তা ও কল্পনাও আল্লাহ জানেন!

তিনি সেটা জানেন

যখন উষ্ণ বায়ু ও শুষ্ক আবহাওয়া নিয়ে শরৎকালের আগমন ঘটে তখন আপনি আপনার পা দিয়ে কিংবা কল্পনায় ভর দিয়ে গাছ-গাছালিতে ভরপুর এক জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন। দেখতে পাবেন লক্ষ লক্ষ হলুদ পাতা ডালকে বিদায় জানিয়ে মাটিতে নেমে আসছে। তৈরি করছে শরতের সীমাহীন মানচিত্র! তখন আল্লাহর বাণীটা পড়ুন—

...وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا... ﴿٥٩﴾

এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না।[১]

তিনি তা জানেন...

ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, একজন লোক একবার রাতের বেলা অনেক গাছের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তীব্র বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। লোকটা মনে মনে বলল, 'আচ্ছা, আল্লাহ কি জানেন কোন পাতাগুলো পড়ছে?' তখন জঙ্গলের পাশ থেকে গভীর আওয়াজ বেরিয়ে এলো—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।[২][৩]

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৫৯

[২] সূরা মুলক, আয়াত : ১৪

[৩] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ২১৪

এত বিপুল পরিমাণ পাতার সংখ্যা আপনার রব জানেন!

থামুন! আল্লাহ কি বলেছেন, 'সংখ্যা জানেন?' নাকি বলেছেন, 'সেগুলো জানেন?'

শুধু সংখ্যা না, তিনি পাতাগুলোর সাথে জড়িত সকল খবরাখবর জানেন!

পাতার আকৃতি, ওজন, শিরাবিন্যাস, স্বাদ এবং উপকরণ। তিনি জানেন এই পাতা কি সরল নাকি যৌগিক? এর শিরার বিন্যাস কি সমান্তরাল নাকি জালিকাসম্পন্ন? তিনি জানেন কোন মুহূর্তে পাতাটা খসে পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, পাতা জন্মানোর আগেও তিনি পাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন!

তিনি তা জানেন...

তারপরই পরম সত্য আল্লাহ বলেন—

...وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ... ﴿٥٩﴾

.....

আর জমিনের অন্ধকারে একটি শস্য দানাও অঙ্কুরিত হয় না[১] যেটা তিনি জানেন না!

.....

আমরা যা কল্পনা করতে পারি আর যা কল্পনা করতে পারি না সবকিছু একত্র করে এরপর আল্লাহ বলেন—

...وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ... ﴿٥٩﴾

.....

আর রসযুক্ত বা শুষ্ক এমন কিছু নেই (যা তিনি জানেন না)[২]

.....

এই বিশ্বজগতের সবকিছুই তো বলতে গেলে শুষ্ক আর রসযুক্ত বিষয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, সবকিছুই। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই জানেন!

সালাফ

আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বিষয়টা সালাফে সালেহিনের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৫৯

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৫৯

বিস্তার করত। জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুনিয়া-দর্শনকে পুরোপুরি গুছিয়ে দিত। তাদেরকে আখিরাতমুখী করে তুলত। আখিরাতে আল্লাহর কাছে যেতে হবে, এই আশঙ্কা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যার নিয়ত একনিষ্ঠ হয়, তার এবং মানুষের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য এমন কিছু করে, যার চাইতে ভিন্ন কিছু আল্লাহ জানেন, তাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন।'[১]

আপনি এমন রবের ইবাদত করছেন, যিনি আপনার অন্তরে যা আছে তা জানেন। এমনই যদি হয় আপনার রব, তাহলে তার থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতেই হবে। আপনার অন্তরে তার পর্যবেক্ষণের চিন্তাটা বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ যে রব আপনার হৃদয়ের গোপনীয় বিষয়গুলো জানেন, তার জন্য এমন আমল করা যাবে না যেগুলোতে আমাদের নিজেদের স্বার্থ মিশ্রিত থাকবে, নশ্বর দুনিয়ার প্রতি আমাদের সংকুচিত দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা তার মাঝে থাকবে!

আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকলে তার কাছে দুআ করাটাও সহজ হয়ে যাবে। দুআ ইবাদতের সুউচ্চ স্তর। হাদিসে এসেছে, 'দুআই ইবাদত।'[২] তাহলে যে আপনার ব্যাপারে জানেই না, তার কাছে আপনি কীভাবে দুআ করতে পারেন? যে জানেই না আপনার মুখাপেক্ষিতা কতটুকু, তার কাছে আপনি কীভাবে চাইতে পারেন? আপনার হৃদয়ে যে পরিমাণ তাওহিদ আছে, সেটা যিনি জানেন না তার কাছে আপনি কীভাবে কাকুতি-মিনতি করতে পারেন?

ফুযাইল ইবনু ইয়ায এক লোককে বললেন, 'আমি তোমাকে এমন একটি কথা শেখাব, যা দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম, আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে তোমার হৃদয় থেকে তুমি মানুষকে এমনভাবে বের করে নিয়েছ যে, সেখানে তাঁর জন্য ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনো স্থান বাকি নেই, তাহলে তুমি তাঁর কাছে যা কিছু চাইবে, তিনি তোমাকে দিয়ে দেবেন।'[৩]

আপনার ইবাদত যথাযথভাবে করা এবং দুআর ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা বজায় রাখার প্রথম ধাপ হলো এটা জানতে পারা যে, আল্লাহ জানেন!

---

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া-তাবাকাতুল আসফিয়া*, আবু নুআইম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ২৯৬৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮২৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৬৪৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সিফাতুস সাফওয়াহ*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩০

সহজ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ... ﴿٧٠﴾

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ জানেন।[১]

কিছুক্ষণের জন্য থামুন। আয়াত পুরোটা পড়ার দরকার নেই। কল্পনার চেষ্টা করুন তো, তিনি কী জানেন? আপনি যত কিছুই কল্পনা করেন না কেন সেটা এই আয়াতের চাইতে কম হবে। আসুন আমরা আয়াতটা পূর্ণ করি—

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ... ﴿٧٠﴾

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ জানেন আসমান-জমিনে যা কিছু আছে।[২]

আসমান-জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন!

যত জিনিস, কাজ, কল্পনা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ! আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন! আপনার শরীরের প্রতিটা কোষ তিনি জানেন! জগতের প্রতিটা অণুর ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত তিনি বিস্তারিত জানেন!

দেখলেন তো, কী বিপুল পরিমাণ জ্ঞান! কিন্তু আল্লাহ নিজের এই জ্ঞানের ব্যাপারেই বললেন—

...إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।[৩]

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৭০

[২] সুরা হজ, আয়াত : ৭০

[৩] সুরা হজ, আয়াত : ৭০

আল্লাহর জন্য এতে কোনো ধরনের কষ্ট নেই। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি জ্ঞানী হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। সত্তাগতভাবেই তিনি জ্ঞানী। কোনো তথ্যের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান থাকার আগে সেটা অস্তিত্ব লাভই করতে পারে না। অবশ্যই তথ্য অস্তিত্ব লাভের আগে, পরে ও তথ্য থাকাকালীন সেটার জ্ঞান তাঁর কাছে থাকবেই! যে মুহূর্তে এসে আশ্চর্যবোধ চিহ্নে আপনার চোখ পড়ছে, সেটাও আল্লাহ তাআলা জানেন!

ইবনু কাসিরের ইতিহাসগ্রন্থ

আমার এক ভাবুক বন্ধু আছে। আমি জানি না কতবার সে আমার সাথে আল-আলিম নামটা নিয়ে আলাপ করেছে। এই নামটা শুনলেই সে ভিন্ন এক ধরনের অনুভূতি পায়!

একবার ভাবতে গিয়ে সে আমাকে ইবনু কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* বই নিয়ে আসতে বলল। ইচ্ছেমতো যেকোনো একটা পৃষ্ঠা খুলতে বলল আমাকে। তারপর কিছু জীবনী পড়তে বলল, যাদের মৃত্যুর পর শত শত বছর পেরিয়ে গেছে। যাদের জীবনের সকল চিহ্ন মুছে গিয়েছে। তারপর আমাকে থামিয়ে দিয়ে এটা ভাবতে বলল যে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সবকিছুই জানেন!

আমরা যারা জীবিত আছি, তাদের চেহারার আকৃতি, গলার আওয়াজ, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা সম্পর্কে আল্লাহ যেমন বিস্তারিত জানেন, তেমনিভাবে এই মরে যাওয়া মানুষদের ব্যাপারেও তিনি জানেন।

অমুক বিজয়ী সৈন্যদল, তমুক অবরোধে মারা যাওয়া সৈনিকরা—এদের সংখ্যা ইতিহাসবিদেরা লিখে রাখতে পারেননি, এদের নাম স্মরণ রাখা তো দূরের বিষয়। কিন্তু এদের সবার ব্যাপারে সবকিছু এমন এক সত্তা জানেন, যার কাছ থেকে কোনো কিছুই আড়াল হয় না!

আমার ভাবুক বন্ধু একবার কোনো এক মানচিত্রের অ্যাপ খুলল। খুব কাছে নিয়ে আমাকে একটা মহাসড়কের গাড়ি দেখিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই গাড়ির ড্রাইভার সম্পর্কে কিছু জানো?' আমি না-সূচক উত্তর দিলাম। সে আমাকে বলল, 'কিন্তু আল্লাহ জানেন তার নাম, তার বাবার নাম, তার বাড়ির অবস্থান, তার জীবনের যাবতীয় কষ্ট, তার সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা, তার কর্মস্থলসহ সবকিছু। তারপর আমাদের অজানা এই মানুষটার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে বিবরণ আল্লাহ জানেন, সেগুলো আমাকে বলে চলল!

প্রশান্তি আছে

হ্যাঁ, মুমিনের হৃদয়-বিস্তীর্ণ করে আছে প্রশান্তির অনুভূতি। যখন মুমিন বিশ্বাস করে যে—

...وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

আল্লাহ সকল ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।[১]

যখন আপনার রব, আপনার অভিভাবক ও আপনার রক্ষক জগতে আপনার সবকিছুর ব্যাপারে জানেন, তখন আপনি আর কীসের ভয় পান? কীসের জন্য দুশ্চিন্তা করেন? কী নিয়ে এত ভাবনা করেন? আপনার যত দুশ্চিন্তা, সবগুলোর কারণ আল্লাহ জানেন। কীভাবে দুশ্চিন্তাগুলো দূর হবে, সেটাও তিনি জানেন! যত দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে কষ্টদায়ক করে তোলে, প্রতিটির আর্তনাদের ধরন এবং হৃৎস্পন্দন আল্লাহ জানেন! যত রোগ আপনার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে, সবগুলোর রহস্য এবং চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ঔষধ তাঁর জানা!

আপনার রবের ব্যাপারে ঈমান থাকলে আপনি প্রবল প্রশান্তি পাবেনই!

আপনি যখন দুআ করেন, তখন আল্লাহর কাছে বিস্তারিত সবকিছু বলার দরকার হয় না। শুধু এতটুকু বললেই হয়, 'হে আমার রব! আমি যে বিপদে পড়েছি, সেটা থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।' কারণ আপনি যে বিপদে পড়েছেন, সেটার ব্যাপারে তাঁর চাইতে উত্তমরূপে আর কেউ জানে না। এই বিপদ থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন, সেটাও তাঁর চাইতে ভালোভাবে কারও জানা নেই!

যে রব রাতের গভীরে আপনার দুআ শোনেন, দিনের বেলা আপনার পদচারণা দেখেন, যার কাছে কোনো কিছু গোপন নয়, আপনাকে কী ঘিরে আছে, আপনাকে নিয়ে কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আপনাকে কেন্দ্র করে কে কী পরিকল্পনা সাজাচ্ছে—সব যে সত্তা জানেন, তাঁর সাথে একান্তে আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়াটা খুবই প্রশান্তিদায়ক!

জীবনের নানান প্রতিকূলতা ও কষ্ট-ক্লেশ দেখার পরও আপনার মনে প্রশান্তির অনুভূতি দৃঢ় হয়, কারণ আপনি পরম নির্ভরতার সাথে বিশ্বাস রাখেন যে, আপনার ওপর নেমে আসা সকল কিছু তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সামনেই ঘটছে। আল্লাহ

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ৩

তাআলা কুরআনের ১৩টি স্থানে বলেন—

...وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।[১]

আপনি এই অর্থ দিয়ে নিজের হৃদয়কে পূর্ণ করে নিয়েছেন। যত কিছুই সংঘটিত হোক, সবই তাঁর জ্ঞানের সীমার ভেতরে। কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর এমন প্রজ্ঞা আছে, যার অন্তর্নিহিত দিক সৃষ্টিকুলের কেউ জানে না!

বলুন তো এই আয়াতটা পড়ার সময় আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছিল—

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

আসমানসমূহ ও জমিনের কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।[২]

সকল কিছুর ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান সকল কিছুর ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার সমান।

আপনার হৃদয়ে একটা দুয়ার খুলুন। যে বিষয়টা ঘটা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটা চিন্তা করুন। তারপর পড়ুন—

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ...﴿٤٤﴾

আর আল্লাহকে কোনো কিছুই অক্ষম করতে পারে না।

অসম্ভবের খাতায় আপনি লিখবেন এমন কিছুই নেই। আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা সেই তালিকা থেকে সম্ভাব্যতার খাতায় বিষয়টাকে নিয়ে আসবেন!

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ১৮

[২] সূরা ফাতির : ৪৪

ভয়ও আছে

আপনি যেহেতু জানেন, আল্লাহ সবকিছু জানেন, সেহেতু এটাও জানেন যে, আল্লাহ আপনার মন্দ কাজ, বালকসুলভ পদক্ষেপ এবং বিচ্যুতিপূর্ণ কল্পনাগুলোও জানেন। যে খারাপ কাজগুলো আল্লাহ দেখে ফেলুক এমনটা আপনি পছন্দ করেন না! বরং আল্লাহ দেখে ফেলবেন এটা ভাবতেই আপনি শঙ্কায় পড়ে যান। এ কাজগুলো আপনি করেছেন এমনটা আল্লাহ দেখতে পান, ভাবামাত্র আপনি কেঁপে ওঠেন!

তখনই কুরআনের আয়াত এসে আপনার মন থেকে ভয় দূর করে দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তাঁর জ্ঞান যেমন, সহিষ্ণুতাও তেমন।

...وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

আল্লাহ জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহিষ্ণু।[১]

আপনার কল্পনাগুলো জানা তাঁর জন্য যদিও খুবই সহজ, তবু তিনি পরম সহিষ্ণু। তিনি আপনাকে দ্রুত শাস্তি দেবেন না। শিগগিরই আপনার প্রতিশোধ নেবেন না। বরং তিনি সহিষ্ণুতা ধারণ করে অনুগ্রহ করবেন, ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করে দেবেন।

সকল কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ যে জ্ঞানী, সেটার বিবরণ টানার পর শেষে তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমার কথাটুকু যে আনেন, সেটা কত যে চমৎকার!

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

তিনি জানেন যা জমিনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আসমান থেকে নাজিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। আর তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।[২]

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৫১

[২] সুরা সাবা, আয়াত : ২

এটা এমন প্রশান্তি, যার পরে আর কোনো প্রশান্তি থাকতে পারে না! এমন সুখ, যার পরে আর কোনো সুখ নেই!

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে সতর্ক করেন, তারপর আবার তাঁর সহিষ্ণুতার কথা বলে আমাদেরকে প্রশান্তি দেন।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।[১]

আমরা কত যে পাপ করেছি, তারপর যখনই শাস্তির ভয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তখন হঠাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের স্পর্শ করল, আমাদের জীবনের গতিপথই পালটে দিলো!

আমাদের সামান্য কিছু কাজ আর সীমালঙ্ঘনের জন্য আল্লাহ শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে শুধরে দেন। আর অধিকাংশ পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির আগুনকে আল্লাহ তার অনুগ্রহ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা দিয়ে নিভিয়ে দেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, আবার পরম সহিষ্ণু। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! তিনিই কি বলেননি—

...وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।[২]

জানার পরও সহ্য করে যাওয়া কতই না সুন্দর! কারণ একজন মানুষ অন্যদের গোপন বিষয়গুলো জানলে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান তাঁর সহিষ্ণুতা ও অনুগ্রহকে কোনো অংশে কমিয়ে দেয় না।

সমুদ্রের গহ্বর

আল্লাহর জ্ঞানের সামান্য অংশে জানালা খুললে আমরা যেন মানুষের অজ্ঞতার

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৫
[২] সূরা শূরা, আয়াত : ৩০

সামনের জানালা খুলে দিই। আমরা বুঝতে পারি আমাদের রব সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوٓءُ...﴿١٨٨﴾

বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না।[১]

কিন্তু দুর্বল মানুষ গায়েব জানে না। তাই সে বেশি কল্যাণ লাভ করতে পারে না। দিন-রাত অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে চলে।

যে মানুষটা একটা পাথরে হোঁচট খায়, সে যদি জানত এই পাথরের কারণে তাকে হোঁচট খেতে হবে, তাহলে কি সে সেটা এড়িয়ে যেত না?

যে লোকটা কোনো এক গর্তে পড়ে গিয়েছে, সে যদি জানত তার চলার রাস্তায় এই গর্তটা আছে তাহলে কি সে সতর্ক হতো না?

সে তো গায়েব জানে না, তাই তো হোঁচট খায়, পড়ে যায়, বিফল হয়!

কোনো দুর্ঘটনা ঘটার কয়েক সেকেন্ড আগে যদি সে জানত যে এটা ঘটতে পারে, তাহলে সে এটা এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে কিছুই জানে না।

...وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। [সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬৬]

ফিরাউন যদি জানত সেদিন সমুদ্র তাকে আচ্ছন্ন করে ডুবিয়ে মারবে, তাহলে কি সে আর তার বাহিনীর জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলত? সমুদ্রের গহ্বরে গিয়ে

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮

মৃত্যুমুখে পতিত হতো? যেখানে মাছগুলো তাকে দেখছে, আর সমুদ্রের তলদেশে থাকা ধূসর বালুর সাথে তার চেহারা মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে!

কারুন যদি জানত সেদিন সকালে তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে, তাহলে কি সে রাত কাটানোর জন্য আরেকটা বাড়ি খুঁজে নিত না। যদিও আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, সে যদি মিশরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়েও উঠত, তবু আল্লাহ সেই পাহাড়কে ধসিয়ে দিতেন। কারণ সমস্যা বাড়িতে নয়, সমস্যা বাড়ির মালিকের!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[১]

আমার বন্ধু তার বাবার ঘটনা বলেছিল। বাবা কোনো একজনকে সান্ত্বনা দিতে বের হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি গাড়ি এক্সিডেন্ট করে মারা যান। তিনি জানতেন না যে, তিনি সান্ত্বনা দিতে যাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর বুকে নিহত হয়েছে, তারা যদি তাদের নিহত হওয়ার দিনটা জানত, তাহলে নিশ্চয় তাদের সেদিনের রুটিনটা বদলে ফেলত! কিন্তু তারা জানত না।

আমরা কত আশা করি, কত ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকি! কিন্তু আমাদের মৃত্যু এতসব কিছুর চাইতে কত নিকটে!

চেনা মানুষ

অহংকারী মানুষকে কুরআন থমকে দেয়, যখন তাকে জানিয়ে দেয় যে, তার সবকিছুই আল্লাহর জানা। তার জীবনে গোপনীয় কিছু নেই, চোরাই পথে লুকায়িত কিছুর অস্তিত্ব নেই! কারণ তার রব তার ব্যাপারে সবকিছু জানেন। তিনি তার

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ৩৪

সবকিছু দেখেন। তিনি তার সবকিছু শোনেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

আপনার সামনে দূর থেকে যে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, সেটা তিনি জানেন। আপনি পেছনে যে বিপুল আকৃতির বিশ্ব রেখে এসেছেন, সেটাও তিনি জানেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ... ﴿١١٠﴾

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন।[১]

সকল কিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে। আর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলার আগ থেকেই তিনি জানেন যে, এগুলো এভাবে অগ্রসর হবে। আপনি কোন কোন জায়গায় যাবেন, কোন কোন মানুষের সাথে আপনার দেখা হবে, কতদিন বেঁচে থাকবেন, কোন সময়গুলোতে নতুন কিছু দেখে চমকে উঠবেন—সব তিনি জানেন! এই সবই আপনার সম্মুখের জিনিস।

আবার তিনি জানেন আপনার পশ্চাতে কী আছে। আপনার স্মৃতি, শৈশব, কৈশোর, অতীতের যত মানুষ, চিন্তা ও ভাবনা আপনি আপনার স্মৃতির পাতায় জায়গা দিয়েছেন তা সবই তিনি জানেন। বরং তিনি এও জানেন যে, যদি আপনার অতীতে একটা বিষয় সামান্য বদলে যেত, তাহলে সেটার কারণে আপনার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কেমনটা হতো!

জীবনে কি সামনের বা পেছনের বাহিরে কিছু আছে? আল্লাহ যে সবকিছু ঘিরে আছেন—কথাটার অর্থ এটাই! তিনি জানেন কী ঘটেছিল, আর কী ঘটবে! তিনি জানেন কী ঘটেনি, আর সেটা ঘটলেও কীভাবে ঘটত!

জাহান্নামবাসীরা চাইবে দুনিয়ায় ফিরে নিজেদের জীবনটা যদি বদলে দিতে পারত। কুফরি ও পাপাচার থেকে ফিরে যেতে পারত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

আর তাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আবার তারা তা-ই করত।[২]

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১১০

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ২৮

তিনি জানেন তাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে তারা কী করত! তারা আগের মতো কুফরি আর পাপ কাজে জড়িয়ে যেত!

আপনার মাথায় যে কল্পনাগুলো আসে, যে কথাগুলো সতর্কতার সাথে ফিসফিস করে বলেন, যে ভাবনাগুলো গোপনে মানুষকে বলেছেন এবং নিশ্চিত আছেন যে কারও কানে পৌঁছেনি বা কেউ বুঝে যায়নি—সব আল্লাহর জানা!

...وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো।[১]

...أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ... ﴿١٤﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না?[২]

ইমাম কুরতুবি বলেন, 'অর্থাৎ যিনি গোপনীয়তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি গোপন বিষয়গুলো জানেন না?'[৩]

আপনার মনের যে মানচিত্রে নানান স্বপ্ন ধারণ করেছেন, যেখানে আপনার সব ভাবনাকে সিন্দুকের মতো সঞ্চিত করেছেন, সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এমন এক সত্তা জানেন—

...يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

যিনি জানেন তাদের অন্তর কী গোপন রাখে আর কী প্রকাশ করে।[৪]

আপনি প্রকাশ করেন আর না-ই করেন, আপনি যা প্রকাশ করেন তা অন্তরে থাকা

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৯৯

[২] সুরা মুলক, আয়াত : ১৪

[৩] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ২১৪

[৪] সুরা কাসাস, আয়াত : ৬৯

বিপুল পরিমাণের সামান্য অংশ মাত্র। কিন্তু আপনার হৃদয় পুরোটা আল্লাহর জ্ঞানের সামনে উন্মোচিত ও প্রকাশ্য।

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

আর যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গোপন ও অতি গোপন সবই জানেন।[১]

গোপনীয় বিষয় আমরা জানি। কিন্তু অতিগোপন কী জিনিস? মুফাসসিরগণ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মনের ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা। যেটা আমাদের ভাবনাতেও আসেনি! মনের গভীরে হঠাৎ জেগে ওঠা চিন্তা, যা বোঝাই যায় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।[২]

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৭

[২] সুরা ক-ফ, আয়াত : ১৬

আল-ফাত্তাহ

দুনিয়া এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। আর এ দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে যেন তালা মারা হয়েছে। যেদিকেই যাবেন, আপনি কেবল নিরাশাই পাবেন। একের পর এক হতাশা এসে ভর করবে। এমনকি আপনার চারদিকে সবকিছু দিনদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাওয়ার মাত্রাও অনেক বেশি।

কিন্তু উন্মোচনকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ সকল জটিল বিষয়কে উন্মোচন করে দেন। জীবনের সব ধরনের প্রতিকূলতাকে দূর করে পথচলা সহজ করে দেন। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে তোলেন। তাঁর হাতেই মুক্তির সমস্ত চাবিকাঠি।

আসুন আমরা এই মহান নামে চোখ বুলিয়ে দেখি যদি আল-ফাত্তাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না থাকতেন, তাহলে জীবন কতটা অস্থিরতায় পরিপূর্ণ হতো।

সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا... ﴿٢﴾

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে তা নিবারণ করার কেউ নেই।[১]

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ২

সুতরাং রহমত তথা অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় যাতে করে সেটা প্রবাহিত হয়ে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে দিতে পারে!

আপনি যদি এমন চিরন্তন স্থায়ী রহমত চান, যার প্রবাহ কখনোই বন্ধ হয়ে যাবে না, তাহলে আল্লাহর কাছে চান। আর স্মরণ রাখুন, 'তা নিবারণ করার কেউ নেই।'

আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, আপনি আপনার জীবনকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অলংকারে সাজিয়ে দেবেন। কারণ এই অনুগ্রহ ও নিয়ামত স্থায়ী থাকার অন্যতম শর্ত হলো তাঁর শুকরিয়া আদায় করা।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ... ﴿٧﴾

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা পোষণ করো তাহলে অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেবো।[১]

কৃতজ্ঞতা শুধু রহমত থাকার নিশ্চয়তা দেয় না, বরং তা বৃদ্ধির ব্যাপারেও নির্ভরতা এনে দেয়!

কিন্তু 'সুসংবাদের' নিয়মের কথা কি শুনেছেন?

আল্লাহ যে রীতিনীতি পছন্দ করেছেন, আপনার কাছে পৌঁছানোর আগেই যে অনুগ্রহের সুসংবাদ দিতে চেয়েছেন, সেটা হলো আপনার তৃষিত অন্তরকে সজীব করা এবং ক্লিষ্ট হৃদয়কে সুসংবাদের মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তোলা। আল্লাহর প্রেরিত অনুগ্রহের সুবাতাস যখন অতি সন্তর্পণে আপনার অনুভূতিতে কড়া নাড়বে, তখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হবে যে, আপনার স্বপ্ন অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আপনার ওপর থেকে বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার ক্ষণটা আসন্ন!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ... ﴿٤٨﴾

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন।[২]

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭

[২] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৪৮

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে 'সুসংবাদের' নিয়ম তুলে ধরছে!

আল্লাহ শুধু রহমতই পাঠান না, রহমতের আগে সুসংবাদ পাঠিয়ে দেন যেটা আপনাকে রহমত ও বরকত গ্রহণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলে।

সুসংবাদ হিসেবে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার পর সবদিক থেকে আল্লাহর দান অবিরত ঝরতে থাকে। আপনি অবাক হয়ে যান, কীভাবে এত কিছু ঘটল! এই তো গতকালই আপনি নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে, এমনটা ঘটা পুরোই অবাস্তব!

জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন

আল্লাহ কিছু বান্দার জন্য যে বিষয়টা উন্মোচিত করে দেন, সেটা হলো জ্ঞানের উন্মোচন। আল্লাহ জ্ঞান থেকে, জ্ঞানে এবং জ্ঞানের জন্য দুয়ার খুলে দেন!

জ্ঞান থেকে খুলে দেওয়ার নমুনা হলো ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। তার কাছে মাঝে মাঝে কুরআনের কিছু বিষয় কঠিন মনে হতো। তিনি সেগুলোর জন্য শত শত তাফসির পড়তেন। কিন্তু সঠিক অর্থ খুঁজে পেতেন না। তারপর জমিনে বের হয়ে মাটির সাথে চেহারা ঘষে (সিজদায়) আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলতেন, 'হে দাউদের শিক্ষক, আমাকে শেখান। হে সুলাইমানের বুঝদাতা, আমাকে বুঝিয়ে দিন।' এরপর তার ওপর জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত হয়ে যেত। অনবরত জ্ঞান তার ওপর নেমে আসত। তাই এই মহান ব্যক্তিত্ব যা লিখতেন, সবকিছুতেই তার ওপর নেমে আসত আল্লাহর অনুগ্রহ।

এটা জ্ঞান থেকে এক বিশেষ ধরনের প্রাপ্তি, যেটা পূর্ববর্তীদের লেখনী বা মুফাসসিরদের বক্তব্যে তিনি পাননি।

আর জ্ঞানে দুয়ার খুলে দেওয়ার নমুনা হলো কখনো কখনো একজন আলিম দুর্বল যোগ্যতা নিয়ে একটা জ্ঞানে সময় দিতে থাকে। তার জন্য এক সময় জ্ঞানটা কঠিন থাকলেও ধীরে ধীরে সেটা সহজ হয়ে ওঠে। এই প্রকারের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উদাহরণ হলো রাবি মুরাদি রাহিমাহুল্লাহ। বলা হয়, তিনি মাসআলার ধরন নির্ণয়ে খুবই দুর্বল ছিলেন। ইমাম শাফিয়ি তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এক মাসআলা বহুবার বলতেন। অবশেষে তিনি বুঝতেন। একবার তাকে তিনি বলেন, 'রাবি, আমি যদি তোমাকে জ্ঞান খাইয়ে দিতে পারতাম, তাহলে খাইয়ে দিতাম।'[১] কয়েক বছর যেতে না যেতেই আল্লাহ তাকে জ্ঞানে দুয়ার খুলে দিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন শাফিয়ি

---

[১] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, ইবনু আব্দিল বার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৩

মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকিহ। বরং ইমাম শাফিয়ির সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি এই মাযহাবে অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের একজন!

আমাদের যুগেও হাদিস-বিশারদদের একজনের ঘটনা শুনেছিলাম। তিনি একটা হাদিস পর্যন্ত মুখস্থ করতে পারতেন না। সঙ্গী-সাথিদের মাঝে মুখস্থের দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন। তিনি মসজিদে এক ইতিকাফে বসে শুধু এই দুআই করেন যেন আল্লাহ তার জ্ঞান বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আমার ইতিকাফ শেষ হওয়ার পরপরই দুআ কবুল হয়ে গেল। এরপর থেকে আমি যে হাদিসই শুনি, আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়!'

আর জ্ঞানের জন্য দুয়ার উন্মোচনের নমুনা দুনিয়ার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরিস আশ-শাফিয়ি। এক বৃদ্ধা তাকে একটা কথা বলেছিল, সেটার বদৌলতে আল্লাহ তার জন্য জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর কতই না উপকারী সেই জ্ঞান! বৃদ্ধা তাকে কবিতা রচনা করতে দেখে বলেছিলেন, 'যৌবনে কবিতা অলংকার, কিন্তু বার্ধক্যে এটাই কদর্যতা।' তখন শাফিয়ি বলেছিলেন, 'তাহলে যৌবন আর বার্ধক্য উভয় অবস্থাতে কোনটা অলংকার?' বৃদ্ধা তাকে বলেন, 'ফিকহ!' এরপর তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন! এমনকি তিনি উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। উসুলুল ফিকহ ছিল কিছু বিচ্ছিন্ন ও অগোছালো বিষয়। তিনি এটাকে সুবিন্যস্ত করে একটা শাস্ত্র হিসেবে দাঁড় করান এবং এর ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। রাহিমাহুল্লাহ।

ইমাম মুহাদ্দিস যাহাবির হাতের লেখা দেখে ইমাম বিরযালি বলেন, 'তোমার লেখা মুহাদ্দিসদের লেখার মতো।' এরপর আল্লাহ তার কাছে হাদিসকে প্রিয় করে তোলেন। তিনি তার যুগে হাদিসের ইমামে পরিণত হন! আর এটা আল্লাহর সাহায্য এবং তাওফিক ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়।

দুআর দ্বার উন্মোচন

দুআর দ্বার উন্মোচনের একটা দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তাঁর স্মরণ, প্রশংসা ও দুআ আপনার সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন!

দুআর ক্ষেত্রে পথ খুলে যাওয়ার দুটি চিত্র—

আল্লাহ আপনার সামনে তাঁর প্রতি বিনীত হওয়ার পথ খুলে দেবেন। আপনি দুআ-জিকির করতে গেলে এক অদ্ভুত অনুভূতি আপনাকে আচ্ছন্ন করবে। যারা বিষয়টা চর্চা করেছে, তারাই শুধু এই অনুভূতিটা জানে। দুআর মুহূর্তে আপনার

সকল পার্থিব কামনা তুচ্ছ হয়ে যাবে। আপনার সকল বিপদ হাওয়ার মতো মিলিয়ে যাবে। মুহূর্তের জন্য মনে হবে এই অদ্ভুত অনুভূতির মাঝেই যদি সমস্ত জীবন পার করে দেওয়া যেত। দুআর সময়টাতে নিজেকে অনুভব করবেন প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমনভাবে কাকুতি-মিনতি করছেন, যেন তাকে দেখছেন। মানুষের জীবদ্দশায় এটা এক বিরল মুহূর্ত। যে ব্যক্তি এই অনুভূতি লাভ করেছে, তার দুআ কবুল হওয়ার বিষয়টা নিজের জুতার ফিতার চাইতেও কাছে!

এই দুআর মুহূর্তটা চিন্তা করলে আমার সামনে ভেসে আসে বদরের যুদ্ধের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর মুহূর্ত। সেদিন দুআ করার সময় তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিল, এমনভাবে মুহূর্তটা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল যে, তিনি যেন ভুলে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাকে যুদ্ধ কিংবা গনিমতের আশ্বাস দিয়েছেন। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে সেটা মনে করিয়ে দেন!

আপনি যদি এই স্বাদ পেয়ে যান, এই অনুভূতি যদি আপনার মাঝে আসে, তাহলে জীবনের এক অসাধারণ মুহূর্ত আপনি পেয়ে গিয়েছেন। এটা বারবার পাওয়ার জন্য পুরোদমে লেগে থাকুন। কারণ এর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। এটাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য। আপনি সমগ্র দুনিয়াকে ভুলে যান। আপনার সকল কাজকে স্থগিত রাখুন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ সব কাজ বাদ দিন। কারণ একজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা কল্পনা করতে পারে, আপনি সেটা পেয়ে গিয়েছেন। সবচেয়ে মহান যে বিষয়টা ভাবতে পারে, আপনি তাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

আর দ্বিতীয় যে চিত্রটা ঘটতে পারে সেটা হলো আল্লাহ আপনার সামনে তাঁর প্রশংসা ও দুআ করার রাস্তা এমনভাবে খুলে দেবেন, যেমনটা আপনি আগে জানতেন না কিংবা ভাষায় যে বিষয়টা আগে প্রকাশ করতে পারতেন না। আমার মনে হয় না এটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারও ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা কেবল একটা অবস্থায় তিনি পাবেন, যখন তিনি আমলনামা পেশের দিন আরশের নিচে সিজদাহ করবেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, সেদিন এত পরিমাণ প্রশংসার পথ তার সামনে খুলে যাবে, যা তিনি আগে জানতেন না! হয়তো আল্লাহর এমন গুণবাচক চমৎকার নাম আছে, যা তিনি আগে জানতেন না! এমন অনেক সুউচ্চ গুণাবলি আছে, যে বিষয়ে তিনি অনবগত ছিলেন। হয়তো আল্লাহর এমন অনেক মহান কর্ম আছে, যা তিনি আগে অনুধাবন করেননি। সেই মুহূর্তেই কেবল তিনি সেটা জানতে পারবেন। তাই তখন সেই নাম, গুণাবলি ও কাজের মাধ্যমে তার প্রশংসা করবেন। এভাবে অনুগ্রহদাতার পক্ষ থেকে তিনি অনুগ্রহ লাভ করবেন, উন্মোচনকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ থেকে অর্জন করে

নেবেন মহান বিজয়।

কিন্তু আংশিকভাবে কিছু বান্দাকে আল্লাহ বদান্যতাস্বরূপ এটা দিয়ে থাকেন। তিনি কিছু বান্দার হৃদয়ে এমন শব্দ, বাক্য এবং দুআর পথ উন্মোচন করে দেন, যেটা সে নিজের বিবেক দিয়ে প্রচেষ্টা করলে কখনো অর্জন করতে পারত না। কিন্তু তার জিহ্বা থেকে হঠাৎ এই দুআ উচ্চারিত হয়, আর হৃদয় এটাকে গভীর থেকে প্রবাহিত করে।

নববির কান্না

আল্লাহ তাঁর বান্দার সামনে সবচেয়ে মহান যে জিনিসটা খুলে দেন সেটা হলো কুরআন তিলাওয়াত, হিফয ও সে অনুযায়ী আমল করা।

প্রতিবন্ধকতা যত বেড়ে যায়, এই বিষয়ে তাওফিক ও সহজতার মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়। ইয়াসিন আল-মারাকিশি ইমাম নববির ব্যাপারে বলেন, 'আমি যখন নববিকে দেখি, তখন তার বয়স ১০ বছর। বাচ্চারা তাকে তাদের সাথে খেলার জন্য জোর করছিল। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারা তাকে জবরদস্তি করছিল সে জন্য সে কান্না করছিল। খেলার সময়টাতে সে কুরআন পড়ছিল। আমার মনে তখনই তার প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল!' কুরআনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়া এই ছেলে পরবর্তীকালে কী হয়েছিলেন, তা নিশ্চয় বলার প্রয়োজন নেই! আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে যে বরকত দিয়েছিলেন, সেটা তো সকলেই জানে। তার ক্ষুদ্র জীবনে রচিত বইগুলোর যে বরকত, সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন আল্লাহ তার জন্য কী বিশেষ অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

দূরবর্তী উদাহরণ টেনে আনার দরকার নেই। আপনি আসর বা মাগরিবের পরপর যেকোনো একটা মসজিদে ঢুকে পড়ুন। দেখতে পাবেন ছোট ছোট শিশুরা আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করার কাজে মনোনিবেশ করেছে। তারপর পথে বেরিয়ে দেখুন তাদের সমবয়সী বা বড়-ছোট অনেকে রাস্তায় খেলাধুলা করছে। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তাঁর কিতাব পড়ার জন্য বান্দাদের মাঝে যাকে পছন্দ করেন তাকে বাছাই করে নেন। যার জন্য ইচ্ছা তিনি কল্যাণ ও জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

বিস্ময়কর উন্মোচন

আল্লাহর উন্মোচিত দুয়ারসমূহের মাঝে অন্যতম হলো আল্লাহ আপনাকে এমনভাবে দেবেন যেভাবে অন্য কাউকে তিনি দেন না!

আপনাকে তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বিপুল পরিমাণ দেবেন, যেটা অন্য অনেকে লম্বা সময় জুড়ে পেয়েছে। বলা হয়, তাফসিরগ্রন্থ *আল-কাশ্‌শাফ* প্রণেতা

যামাখশারি মক্কায় বসবাসের সময় তাফসির লেখার কাজ শুরু করেন। তখন তার বয়স ষাট-সত্তরের মাঝামাঝি। তিন বছরে তিনি যে পরিমাণ লেখেন, তা অন্যরা ত্রিশ বছরে লেখে! তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাওফিক দিলেন এবং পথচলা সুগম করে দিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পরিমাণ সময় আমার লাগল। এমন পূর্ণ তাফসির লিখতে ত্রিশ বছরের বেশি প্রয়োজন হতো। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে লিখতে পারাটা আল্লাহর হারামের (বাইতুল্লাহ) অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহর সম্মানিত হারাম থেকে আমার ওপর বরকত প্রবাহিত হয়েছে।'[১]

বর্তমান যুগের এক আলিম ও মদিনার বিচারকের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছি যে, তিনি শৈশবে শুধু রমাদান মাসেই কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। এটা কল্পনা করা কঠিন, তবে আল্লাহ যদি কারও জন্য কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দেন তাহলে সম্ভব। কারণ আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান! আমি সাক্ষ্য দিতে পারি তার মতো মুখস্থ কারও মাঝে দেখিনি। তিনি শুধু জ্ঞানের দিক থেকে নয়, জীবনের বহু জিনিস মুখস্থ রাখতেন। বরং জীবনে যা যা ঘটেছে তার সাথে সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তার জানা। আল্লাহ তার জ্ঞানে বরকত দিন।

এর আরেকটা নমুনা হলো প্রতিকূল সময়ে পূর্ণ দান পাওয়া। ইমাম ইবনুল কাইয়িম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত রচনা করতে গিয়ে যে বিশাল বই লিখেছেন, সেটার ঘটনা অনেকটা এমনই। আমি বলতে চাইছিলাম *যাদুল মাআদ ফি-হাদয়ি খাইরিল ইবাদ* বইটির কথা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অদ্ভুতভাবে জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত হওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা!

তিনি সফর অবস্থায় বইটি রচনা করেন। তখন তিনি ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তার মন ছিল বিক্ষিপ্ত। পরিবার-পরিজন এবং বইপত্র থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি বইয়ের শুরুতে বলেন—

'কিছু সামান্য কথা লিখছি। যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার জীবনী ও জীবনাচার জানতে চায়, তার জন্য এই বই জানা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রকাশ্য-গোপনীয় সব ধরনের দুশ্চিন্তা নিয়েই আমার মন এগুলো রচনা করেছে। যদিও আমার পুঁজি সামান্যই, যার সামনে বন্ধ দরজা খুলে যায় না কিংবা যার সাথে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে না। অধিকন্তু আমি সফর অবস্থায় লিখেছি, মুকিম অবস্থায় না। আমার অন্তর নানা প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত ছিল। হিম্মত এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বইপত্রও ছিল না। যার সাথে আলোচনা করলে জ্ঞানের দুয়ার

---

[১] *তাফসিরুয যামাখশারি* (আল-কাশ্‌শাফ আন হাকাইকি গাওয়ামিযিত তানযিল), ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ৪

খুলে যেত, সে ছিল অনুপস্থিত।'[১]

এত কিছুর পরও আপনি যখনই এই বইটা পড়তে যাবেন, অনুভব করবেন আলো আপনাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আপনার যেন মনে হবে তিনি যখন বইটা রচনা করছিলেন তখন ফেরেশতারা তাকে সাহায্য করছিল। তারা ইমামকে মাসআলাগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তার কাছে বেশ কিছু বিষয় সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছিল। তাকে জ্ঞানের সঠিক রাস্তায় পৌঁছে দিচ্ছিল।

এর আরেকটা নমুনা হলো আপনি একটা কিছু চাইলেন, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে এর চাইতেও মহান কিছু দান করলেন!

বলা হয়, হাফিয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ যখন উমরা করতে গেলেন, তখন একটা হাদিসের ওপর আমল করলেন। হাদিসটা হলো, 'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তা পূর্ণ হয়।'[২] তিনি যমযমের পানি পান করে দুআ করেন যেন হাদিসে ইমাম যাহাবির মতো হতে পারেন। বলা হয়, তিনি হাদিসে তার মতো বা তার চাইতেও বেশি মর্যাদায় উন্নীত হন!

দেখুন এই আলিম নিজের জন্য যা চেয়েছিলেন, তার তুলনায় আল্লাহ তার জন্য যা চান, সেটা আরও বড় ছিল! এর সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণ হলো মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। তিনি আগুন দেখে শুধু আগুনের জন্যই সেখানে যান। চেয়েছিলেন একটু আগুন ধরিয়ে এনে উত্তাপ নেবেন। তার মাথায় একবারও আসেনি যে, আল্লাহ তাকে আগুনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেবেন। তিনি যত কিছু চাইতে পারেন, সবকিছুর চাইতে সবচেয়ে দামি বিষয় আল্লাহ দেবেন। আল্লাহ কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার সাথে কথা বলবেন। তাকে নবুয়ত দেবেন। তাকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করবেন। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচজন মানুষের একজন হওয়ার নিয়ামত তাকে দেবেন!

তিনি চেয়েছিলেন আগুনের উত্তাপ, হয়ে গেলেন নবি। আগুনের ফুলকি কোথায় আর আল্লাহর দান কোথায়। অগ্নিশিখার তুলনায় আল্লাহর দেওয়া এই উপহার, এই বিশেষত্ব কত বড়! মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন—

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا... ﴿٢﴾

---

[১] *যাদুল মাআদ ফি-হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩০৬২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৮৪৯; হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি।

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে তা নিবারণ করার কেউ নেই।[১]

উন্মোচনকারীর দান

আল-ফাত্তাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যা দান করেন তা হলো, তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। মানুষদের মাঝে তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেন। মানুষের হৃদয়ে তাদের ভালোবাসার বিস্তার করেন। কেউ তাদেরকে দেখলেই ভালোবেসে ফেলে। আল্লাহর উন্মোচন ও দানের এই মহান রূপের বিবরণ সবচেয়ে সুন্দরভাবে এক কবির কথায় প্রকাশ পেয়েছিল। আমি সবসময় এগুলো বলি। যখনই আমার স্মরণ পড়ে, আমি প্রায় ১০ বার কথাগুলো আওড়াই, অর্থগুলো হৃদয়ঙ্গম করি, মর্মার্থের স্বাদ অনুভব করি—

আল্লাহ যখন ভালোবাসেন বান্দার গোপন কিছু
উন্মোচনকারীর দান তখন ছুটে তার পিছু পিছু
রবের জন্য বান্দার নিয়ত খাঁটি যদি হয়
প্রভুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন তার হৃদয়।

উন্মোচনকারীর দান মানুষের সামনে সবসময় প্রকাশ পায় কিছু অখ্যাত বান্দাদের মাঝে। তাদেরকে প্রায় কোনো মানুষই চিনে না। তারা উয়াইস কারনির মত, যিনি নবিজির ভাষ্যমতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ি। এক ব্যক্তি তার ব্যাপারে বলেন, 'আমরা উয়াইসের কাছ থেকে যেমন কথা শুনতাম, অন্যদের থেকেও শুনতাম। কিন্তু উয়াইসের কথা শুনলে নুরের ঝলক অনুভব করতাম!' আর এটাই আল-ফাত্তাহ তথা উন্মোচনকারীর (বা শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারীর) দান।

উন্মোচনকারী আল্লাহর দানের নমুনা ইবনু মাসউদ দেখেছিলেন রাবি ইবনু খুসাইমের চেহারায়। তাই তাকে বলেছিলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে দেখলে অবশ্যই ভালোবাসতেন!'

দানের আরেকটা নমুনা আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম দেখতে পান নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায়। তাই তো তাকে বলেন, 'আমি বুঝতে পারলাম তার

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ২

চেহারা কোনো মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না!'

একজন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নবিজিকে স্বপ্নে দেখেন। তার ভাষায়, 'আমি ঘুম থেকে ওঠার পর নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম, এমন একটা মানুষকে লোকজন কীভাবে মিথ্যুক বলে গণ্য করতে পারে?'

এই দান শুধু চেহারার মাঝে সীমিত না যে তাতেই শুধু প্রকাশ পাবে। বরং কথাবার্তায়ও আলাদা নুরের ঝলক থাকতে পারে। অদ্ভুতভাবে ব্যক্তির জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আমি আমার এক আত্মীয়কে চিনি। তিনি বিধবা ও এতিমদের দেখাশোনা করতেন। তাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নিতেন, দায়িত্বগুলো নিজে পালন করতেন, হাসপাতালে তাদেরকে দেখতে যেতেন এবং তাদেরকে মাদরাসায় পৌঁছে দিতেন। আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি এই এতিমগুলো বড় হয়ে যাওয়ার পরও, তিনি এখন কোনো বিপদে পড়লে বা সরকারি অফিসে গেলে তার কাজগুলো খুব সহজে হয়ে যায়, যেটা অন্য অনেকের জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবত এতিম আর বিধবাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কারণে আল্লাহ তার জন্য এমন দানের পথ খুলে দিয়েছেন!

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে আল্লাহর এমন উন্মোচনের অংশ। কিন্তু আমরা এমন কিছু দিকের আলোচনা আনতে চেষ্টা করেছি যা বইটির অন্য কোনো অংশে আলোচনায় আনিনি। কারণ এই আলোচনা এই নামকে সূক্ষ্মভাবে স্পর্শ করে যায়। আর এই দিকগুলো হলো জ্ঞান ও ঈমান।

আল্লাহর কাছে চাইব, যারা এই লেখাগুলো পড়ছে তাদের সবার জীবনে নিজের দানের পথ এভাবে উন্মুক্ত করে দিন। তাদের সবার জীবনে তাঁর অনুগ্রহের সুবাস প্রবাহিত করুন। তাদের সবার মাঝে তাঁর বিশেষ দানের প্রকাশ ঘটান। তিনি তো বদান্য, কোনো কিছু দান করতে কার্পণ্য করেন না। তিনি তো অনুগ্রহ উন্মোচনকারী, সর্বজ্ঞ।

আল-কাদির

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।[১]

নিজের ব্যাপারে আল্লাহ এমনটা বলেছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ঘটবেই; কারণ তিনি যা কিছু চান তার সবই করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা সিদ্ধান্তে রদবদল করার কেউ নেই।

কী মহান সেই আকিদা, যা মুমিনের মাথা উঁচু করে দেয়। তার রব আল-কাদির তথা ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছামতো সবকিছু করেন। মুমিনের সামনে অলৌকিক কিছু ঘটার একটাই উপায়, আল্লাহ সেটা চাইবেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছার এই দরজায় অনবরত সে কাকুতি-মিনতি ও দুআ দিয়ে কড়া নেড়ে চলবে। দুআর ইবাদত রূপ নেবে দুআ কবুলের অপেক্ষার দুআয়। কিন্তু তার চিন্তার আকাশে হতাশার মেঘ পেরিয়ে যাবে এমনটা অসম্ভব, কারণ তার রব আল-কাদির তথা ক্ষমতাবান।

যে পানি গড়িয়ে পড়ে না

জগতের প্রতিটি প্রান্তে আর জীবনের প্রতিটি পরতে আল্লাহর ক্ষমতা পরিদৃশ্যমান। আপনি কথা বলতে পারেন, দেখতে পারেন, শুনতে পান—শুধু এগুলোই ক্ষমতা

[১] সুরা বুরুজ, আয়াত : ১৬

নয়। বরং আল্লাহ এমন বহু প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে আপনি দেখতে পান না, এমন বহু প্রাণীকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে আপনি শুনতে পান না, বহু প্রাণীকে তিনি কথা বলার ক্ষমতাও দেননি! আল্লাহর ক্ষমতার কারণেই আপনি এমন আর এই সৃষ্টিগুলো এমন।

কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো সে কাছের জিনিসগুলো দেখতে পায় না। যে বিষয়গুলোতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সেগুলো তাকে বিস্মিত করে না। নাহলে আসমানে পরিভ্রমণ করে চলা তারকারাজি আর উজ্জ্বল নক্ষত্র তাকে কীভাবে মুগ্ধ না করে পারে!

কেন তার মাথায় একবারও আসে না যে, এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীর অধিকাংশই পানি, কিন্তু সেটা গড়িয়ে পড়ে যায় না?

বৃক্ষের সবুজতা, ফলের পরিপক্কতা আর গোলাপের সুগন্ধি কীভাবে তার ভেতরে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে নাড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারে?

পুরো বিশ্বজগৎ একটা খোলা বইয়ের মতো যার মাঝে মহান আল্লাহর কুদরত অবিরত প্রকাশ পেতে থাকে।

পৃথিবীর দিকে দিকে কত বিচিত্র সৃষ্টি,
আল্লাহর কুদরত দেখে বিস্মিত মানুষের দৃষ্টি।
গলিত সোনায় যেন ভরে আছে মাঠ,
এই তো সেদিন তা ছিল সবুজ নিপাট।
যে দিকেই চোখ যায়, সেদিকেই বিস্ময়
রবের মহিমা এরা গাইছে নিশ্চয়!

নার্গিস ফুল নিয়ে এই পঙ্‌ক্তিগুলো কবি আবু নুআসের। তাকে বলা হয় অশ্লীলতার কবি! এই কবিতার পেছনে একটা ঘটনা আছে। বলা হয়, তিনি মৃত্যুর আগে এগুলো লিখে নিজের বালিশের নিচে রেখে দেন। একজন মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহ আপনার কী করলেন?' তিনি বলেন, 'তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন!' স্বপ্নে তাকে যিনি দেখেন, তিনি অবাক হন। কারণ তিনি আবু নুআসের পাপাচার সম্পর্কে জানতেন। তাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী জন্য আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন?' তিনি বলেন, 'কয়েক পঙ্‌ক্তির জন্য যেগুলো লিখে আমি আমার বালিশের নিচে রেখেছিলাম!' স্বপ্নে তাকে দেখা ব্যক্তি তার বাড়িতে গিয়ে বালিশের নিচে এই পঙ্‌ক্তিগুলো পেয়ে যান। বাস্তবে তার পরিণতি কী আল্লাহই জানেন। তবে

আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি দয়াময়, তাই মাফ করে দিতে পারেন এটাকে অসম্ভব মনে করার কিছু নেই!

বিস্ময়কর এ পৃথিবী

অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়া, রোগীর নিরাময় পাওয়া, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার হওয়া আল্লাহর প্রবল ক্ষমতার কাছে সামান্য একটা বিষয়। মহান অধিপতি আল্লাহর ক্ষমতার কাছে এটা সবচেয়ে সহজ একটা কাজ। তিনি এমনভাবে এগুলো দূর করে দেন, যেন কিছুই ঘটেনি!

আল্লাহ তাঁর মহান কিতাবে এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, বিস্ময়কর এবং সম্ভাবনার দিক থেকে কঠিন বিষয়কে তুচ্ছ বলে অভিহিত করেছেন!

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, এদিকে তার স্ত্রী বন্ধ্যা, তখন সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি প্রায় নাকচই করে দিলেন। এটাই স্বাভাবিক। এমন সময়ে সন্তান হওয়াটাই তো বিস্ময়কর। তখন ক্ষমতাবান আল্লাহ বললেন—

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ... ﴿٢١﴾

সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ।[১]

'সহজ' বলার আগে 'আমার জন্য' বলা প্রমাণ করে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য বিষয়টা শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভব। কিন্তু 'তাঁর জন্য' খুবই সহজ!

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন বাবা ছাড়াই সন্তান জন্ম দেওয়াটা অসম্ভব মনে করেছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলে দেন, 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ।'

বাবা ছাড়া একজন মানুষকে সৃষ্টি করার তুলনায় অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে দেওয়া তো যৎসামান্য ব্যাপার। আপনি যখন হাত তুলে প্রয়োজনের বিষয়টা প্রার্থনা করবেন, তখন অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনি এমন এক ক্ষমতাবান সত্তাকে ডাকছেন, যিনি অলৌকিক কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, অসম্ভব বিষয়কে ঘটিয়ে দিতে পারেন, বিস্ময়কর কিছু বাস্তব রূপ দিতে পারেন!

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২১

আর্তচিৎকার

যে মানুষটা আসমানের দিকে তাকিয়ে দুই পা দিয়ে জমিনে সজোরে আঘাত করে, কিন্তু আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করতে পারেন বা তার বিপদ দূর করতে পারেন বা অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারেন, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা দূরতম মনে করে, তাকে দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি অবশ্যই বড় বিষয়।[১]

দেখুন, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন! সৃষ্ট মানুষকে সুস্থ করা নয়! বিপদ দূর করা বা আশা পূরণ করা নয়!

যে আল্লাহ বড় জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় চাইতে আপনি কীসের এত দ্বিধা অনুভব করেন?

মহাশূন্য বিচরণ করা প্রতিটি তারকা আল্লাহর ক্ষমতার পক্ষে একটা করে পাঠ। এই মহাশূন্যকে অতিক্রম করে এমন প্রতিটি ছায়াপথ মানুষের বিবেকে একটা করে আর্তচিৎকার। চিৎকার করে যেন বলে, তার স্রষ্টা এতটাই ক্ষমতাশীল, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! বিস্তীর্ণ এই জগতের গভীরকে বোঝা যায় এমন প্রতিটি স্তর বারংবার রবের ক্ষমতার অনুভূতিকে মানুষের মনে জাগ্রত করে তোলে, যে রবকে আসমান-জমিনের কোনো কিছু অক্ষম করতে পারে না।

বর্ষণশীল বারিধারা

আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এমন কিছু নেই যা করতে আল্লাহ অক্ষম!

কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, আপনার হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে ভরপুর হতে হবে, আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে আপনার মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেবে, রবের দিকে হাত তোলার সময় দুই হাতকে দ্বিধা থেকে মুক্তি দেবে। আপনি

[১] সুরা গাফির, আয়াত : ৫৭

তার দরজায় এমন হাত দিয়ে কড়া নাড়ুন, যেমনটা মুসার হাত ছিল সাগরে আঘাত হানার সময়।

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾...

ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল।[১]

আমার মাথায় প্রশ্ন আসে, যে আল্লাহ শূন্য থেকে তাকে সৃষ্টি করে অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন, তার সক্ষমতার ব্যাপারে বান্দা কী করে দৃঢ় বিশ্বাসী না হতে পারে? আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার পাশাপাশি এত অগণিত সৃষ্টির অস্তিত্ব দিলেন, অথচ তার দিকে সংশয় ও দ্বিধা নিয়ে আমরা হাত তুলি! দৃঢ় বিশ্বাসীর মতো হাত তুলি না, পরীক্ষকের মতো তুলি!

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। যারা তার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ মনে করে না, তাদেরকে তিনি দেন না!

তাদেরকে তিনি ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা চূড়ান্ত বিপদাপদে পড়ে যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে এক আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য, আল্লাহই তাদেরকে বিপদের গহ্বর থেকে মুক্ত করতে সক্ষম, তখন আসমানে দানের দরজা খুলে বর্ষণশীল বারিধারা নামিয়ে দেন! আর যে অন্তর এখনো সংশয়ের দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটার ডাকে সাড়া দেওয়া তো বহু দূরের বিষয়!

চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[২]

আয়াতটা আমাদেরকে আল্লাহর কুদরতের কিছু অংশ স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কাছে আসমান-জমিনের কোনো কিছু অসম্ভব নয়।

কুরাইশের কাফিররা একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ৬৩
[২] সুরা কমার, আয়াত : ১

সমবেত হয়ে নতুন এবং অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিলো!

তাদের বুদ্ধির পরিধি কতটুকু সীমিত! তারা ভেবে বসল এমন একটা কিছু চেয়ে বসবে যেটা মুহাম্মাদের রব করতে অক্ষম হবেন! আল্লাহর প্রবল ক্ষমতার যে বিবরণ তারা শুনেছিল, সেটার অবসান ঘটিয়ে দিতে পারবে। তাই আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে তাকে বলল, 'তোমার রব যদি চাঁদ বিদীর্ণ করে দেন, তাহলে আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনব!'

তাদের বিবেক-বুদ্ধি এত দূর পর্যন্ত ভাবতে পারল। তারা এমন কিছু চেয়ে বসল যা বাস্তবে ঘটবে এমনটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কখনো কল্পনাই করে না। আর সেটা হলো, এই বিশাল আকৃতির চাঁদটা বিদীর্ণ করে দেওয়া, যাতে পৃথিবীর মানুষজন সেটা দেখতে পারে।

আল্লাহ তাআলা নবিজিকে ওহি পাঠিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করতে বললেন যেন তারা নিজ চোখে ক্ষমতাশীলের ক্ষমতা, মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য এবং প্রবল প্রতাপশালীর প্রতাপ দেখতে পায়। নবিজি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি তোমাদের জন্য চাঁদ বিদীর্ণ করে দিই, তোমরা কি আমার ওপর ঈমান আনবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

তারা 'হ্যাঁ' না বলে যাবে কোথায়? তারা তো এমন কিছুই চেয়েছিল যা ঘটানো কখনোই সম্ভব নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে ইশারা করলেন। কল্পনায় থাকা নিয়মকানুনকে অতিক্রম করে এক নতুন বাস্তবতা প্রকাশ পেল। সবাই দেখতে পেল চাঁদ বিদীর্ণ হচ্ছে। দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এক ভাগ আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপর, আর অন্য ভাগ কুয়াইকিয়ান পাহাড়ের ওপর!

হে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ, কীভাবে তুমি বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো? তুমি কি জানো না, তুমি কতটা অসহায়? তুমি যেকোনো সময় পরিণত হয়ে পারো সামান্য ধূলিকণায়! ছোট্ট শিশু বিকেল বেলায় খেলতে খেলতে সেগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে এক নিমিষে।

এই বিশাল আকৃতির চাঁদ মহান আল্লাহর ক্ষমতার তুলনায় নস্যি।

সমূলে উৎপাটিত

কাফিরটা কোনো এক রাত ঘুমিয়ে কাটাল। সকালে জেগে ওঠার পর তার মাথায় নতুন প্রশ্ন উদিত হলো। তার কাছে মনে হলো এই প্রশ্ন দিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নতুন দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে, নতুন

দ্বীন থেকে বিমুখ করা যাবে!

যে ভেবে বসল এই প্রশ্নের কারণে নবিজি দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার স্ট্র্যাটেজি বদলে ফেলবেন। হতবুদ্ধি করে দেওয়ার মতো এই প্রশ্ন শুনে সংকটে পড়ে তিনি দাওয়াতের কাজে কিছু বিষয় এগিয়ে আনবেন আর কিছু বিষয় পিছিয়ে নেবেন!

মুহাম্মাদ, পাহাড়ের ব্যাপারে তোমার কী মত? আল্লাহ এই পাহাড়গুলো কী করতে পারেন? এই সুউচ্চ, বিশাল আকৃতির পাহাড়গুলো?

পাহাড় নামের এই বিশাল সৃষ্টির সামনে মানুষ ক্ষুদ্র অনুভব করে। তার কাছে নিজেকে মনে হয় আকৃতিবিহীন ক্ষমতাশূন্য একটা অণু মাত্র। আল্লাহ কিয়ামতের দিন এই পাহাড়ের কী করবেন? কাফিরের বুদ্ধি ভেবেছিল আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা মনে হয় মানুষের মতোই, হয়তো একটু বেশি হবে। তাই কিছু বিষয় তিনি পারবেন, আর কিছু বিষয় পারবেন না। তাঁর না পারা জিনিসগুলোর মাঝে আছে এই সুদৃঢ় পাহাড়গুলো।

কাফিরের অন্তর ভেবে বসতে পারে তার চিন্তাটা বেশ শক্তিশালী। কিন্তু মুমিন এটা শোনার পর অনেক কষ্টে হাসি দমিয়ে রাখে!

কাফিরের দাবির জবাব সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে চলে আসে। অজ্ঞতা আর আত্ম-অহমিকার শেকড়কে মূল থেকে উপড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

> আর তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে যাতে আপনি উঁচু-নিচু দেখবেন না।[১]

তাদের আদিম বিবেক-বুদ্ধিতে আয়াতটা প্রবেশ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে তারপর জ্বালিয়ে তারপর আবার বিবেক-বুদ্ধিকে সচল করল। দেখা গেল পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলোবালিতে রূপ নিয়েছে।

উৎপাটিত করে দেবেন! ও আল্লাহ, আপনি কতই না শক্তিমান!

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১০৫-১০৭

আল্লাহ বলেননি, পাহাড় ভেঙে দেবেন বা উলটে দেবেন। ভেঙে দেওয়া বা উলটে দেওয়া পূর্ণ বিক্ষিপ্ততার নিশ্চয়তা দেয় না। বরং পাহাড়ের পাদদেশে এদিকে-সেদিকে বেশ কিছু পাথর থেকে যায়। কিন্তু 'উৎপাটিত করার' কথা বলা হয়, তখন পাহাড়ের বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু কল্পনায় আসে না।

কুরআন এই সমস্ত কাফিরের বিবেক-বুদ্ধিতে থাকা সংশয়ের চূড়ান্ত রূপ বের করে আনে। তারপর সেটার সমুচিত জবাব প্রস্তুত করে রাখে! যাতে করে বিদ্রোহী আত্মাগুলো ঔষধের প্রতিটি ডোজ পুরোপুরি পান করে!

এটা সুস্পষ্ট সত্য আল্লাহর ক্ষমতা! এর সাথে তুলনা করলে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সামান্যই মনে হয়। আল্লাহ 'হও' শব্দের মাধ্যমে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে যা ঘটিয়ে দিতে পারেন, তার সাথে মিলিয়ে দেখলে তুচ্ছই মনে হয়।

অসম্ভবের চাইতেও বেশি

আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার একটা নমুনা হলো আমরা যে বিষয়গুলোকে অসম্ভব বা কঠিন মনে করি, সেগুলোর সীমানায় গিয়ে এটা থেমে যায় না। বরং সৃজনের ক্ষেত্রে তাঁর নিপুণতা যেমন, কোনো কাজ বাস্তবায়নে তাঁর ক্ষমতাও তেমন! আল্লাহ যা কিছু করতে পারেন, সেগুলো আমাদের কল্পনায়ও আসতে পারে না। হোক সেটা সম্ভব, কঠিন কিংবা অসম্ভব বিষয়। যেমন, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করে পথ রচনা করা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো রাসুল ভাবেনি সমুদ্রের মতো সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে। কারণ মানুষের কল্পনাতেও এমন অসম্ভব বিষয় আসে না। সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া শুধু অসম্ভব নয় বরং কল্পনা করাও অসম্ভব! মানুষের চিন্তাশক্তির বহু ঊর্ধ্বে এই জিনিস। কিন্তু 'অকল্পনীয়' বিষয়কে আল্লাহ 'সম্ভবের' কাতারে নিয়ে আসেন। কারণ তিনিই আল-কাদির তথা ক্ষমতাবান। তাঁর ক্ষমতা শুধু মানুষের ক্ষমতা থেকে ভিন্ন এমনটা নয় বরং ক্ষমতার ব্যাপারে মানুষ যা জানে, তার চাইতেও ভিন্ন!

বনি ইসরাইল যখন আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল, তখন যা ঘটেছিল সেটাও নমুনা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ... ﴿١٧١﴾

আর স্মরণ করুন, যখন আমরা পর্বতকে তাদের ওপরে ওঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা। তারা মনে করল যে, সেটা তাদের ওপর পড়ে যাবে।

[সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭১]

পাহাড় ওপরে ওঠানোর বিষয়টা মানুষের কল্পনাতে ধরে না। মানুষ চিন্তা করতে গেলে মনে করে এটা অসম্ভব। কিন্তু চিরঞ্জীব আল্লাহর ক্ষমতা এটাকে 'কল্পনার ঊর্ধ্বের স্তর থেকে বাস্তবতায় নিয়ে আসে। এটা হয়ে পড়ে এমন সত্য, যা বনি ইসরাইল নিজ চোখে দেখে। এটা হয়ে পড়ে এমন হুমকি, যা তাদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়!

যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা করে

আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা হলো তিনি তাঁর অবাধ্য ব্যক্তিদের ওপর শাস্তি দেওয়া থেকে শুধু এ কারণেই বিরত থাকেন যে, তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু! বান্দা যদি একগুঁয়েমির কারণে পাপ কাজে জড়িয়ে আল্লাহর ক্রোধ নাজিল করে, তবু আল্লাহ শাস্তিকে থামিয়ে রাখেন। এই শাস্তিকে থামানোর সাধ্য আর কারোই নেই, এক আল্লাহই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান!

আল্লাহর বাণী—

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

> বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?[১]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, এক লোকের সামনে আয়াতটা পড়া হলে সে বলে বসল, 'হাতুড়ি আর কুঠার আমাদেরকে পানি এনে দেবে।' কথাটা বলার পরপরই তার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। আল্লাহর সামনে এমন স্পর্ধা দেখানোর থেকে আমরা পানাহ চাই।[২]

আমি অবাক হই, এই কথাটা সে উচ্চারণ করতে পারল কীভাবে? কিছু কিছু হৃদয়ে কি আল্লাহভীতির লেশমাত্র নেই, তাহলে অন্তত এই সীমানায় এসে থেমে যেত! প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রতাপ নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো স্পর্ধা দেখানোর বিষয় তো অকল্পনীয়!

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তার *সাইদুল খাতির* বইয়ে বলেন, 'যে পাপে ভোগের

---

[১] সূরা মুলক, আয়াত : ৩০

[২] *তাফসিরুয যামাখশারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮৩

এমন স্বাদ নেই, যেটা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলিয়ে দেবে, সেই পাপের শাস্তি সবচেয়ে দ্রুত হয়। কেননা সেই পাপ যেন আল্লাহর সামনে একগুঁয়েমি ও বিদ্রোহ প্রকাশের নাম। তার ওপর কেউ যদি পাপের মাধ্যমে আল্লাহর ওপর আপত্তি কিংবা তাঁর মাহাত্ম্যের সাথে বিবাদে জড়ায়, তাহলে এমন পাপের কোনো প্রতিকার নেই। বিশেষত যদি এই পাপে লিপ্ত হয় আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তি, তাহলে খুব কম সময়ই তাকে ছাড় দেওয়া হয়।'[১]

তারপর তিনি খোরাসানের এক লোকের ঘটনা উল্লেখ করেন। লোকটা তিনদিনে পুরো কুরআন লিখেছিল। এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কয়দিনে আপনি এটা লিখলেন?' সে বুড়ো আঙুল, তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে ইশারা করে বলে—

...وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾

.....

আর আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।[২]

.....

এ কথা বলার পর তার আঙুল তিনটা শুকিয়ে যায়। পরবর্তীকালে আর কখনো সে এই আঙুলগুলো দিয়ে কিছু করতে পারেনি।

ক্ষমতাবান আল্লাহকে কখনোই অসন্তুষ্ট করা সমীচীন নয়। কারণ তিনি 'কুন' (হও) বলার সাথে সাথে এমন কিছু ঘটে যাবে, যে আপনি নিশ্চুপ হয়ে যাবেন!

এই প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযি উল্লেখ করেন যে এক অলংকারশাস্ত্রে পারদর্শী লোকের একবার মনে হলো সে কুরআনের মতো কথা বলতে পারবে! (আমরা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা থেকে পানাহ চাই) তাই সে নিজের বাড়ির ওপরে একটা কক্ষে একাকী হয়ে সবার কাছ থেকে তিনটা দিন সময় চেয়ে নিল। তিন দিনের মাথায় লোকজন উঠে দেখল তার হাত শুকিয়ে গেছে। আর সে মৃত পড়ে আছে।

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে গেলে তুমি কতটা তুচ্ছ হয়ে যাও!

ইমাম যাহাবি মহান সাহাবি আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে একটা ঘটনা উল্লেখ করেন। সাইপ্রাস বিজয়ের পর যখন বন্দিদেরকে তার সামনে দিয়ে নিয়ে

---

[১] *সাইদুল খাতির*, পৃষ্ঠা : ৩১৪

[২] সুরা ক-ফ, আয়াত : ৩৮

যাওয়া হচ্ছিল, তখন হঠাৎ করে তিনি কেঁদে উঠলেন। সবাই তাকে বলল, 'যে দিনে আল্লাহ ইসলামকে বুলন্দ ও সম্মানিত করেছেন, সেদিন আপনি কাঁদছেন!' তিনি বললেন, 'এই জাতি এক সময় পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাধর ছিল। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা করার পর তাদের কী হলো তা তো তোমরা দেখলে! আল্লাহর অবাধ্যতা করলে বান্দারা তাঁর কাছে কতটা তুচ্ছ হয়ে যায়!'[১] তিনি সত্যই বলেছেন। তারা কতই না তুচ্ছ, কতটা দুর্বল, কতটা অসহায়!

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, যাহাবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২

আল-ওয়ালি

আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহর প্রশংসা করি, কারণ তিনি আল-ওয়ালি। 'আল-ওয়ালি' নামটি দুটি অর্থ বহন করে। প্রথম অর্থ হলো—তিনি এমন অভিভাবক, যাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো—তিনি এমন অভিভাবক, যিনি পরিচালনা ও সাহায্য করেন। বান্দার পক্ষ থেকে বেলায়াত (দায়িত্ব) হলো আনুগত্য ও ইবাদত। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) হলো সহযোগিতা ও কল্যাণ!

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বেলায়াতের স্তর দুটি—ব্যাপক স্তর ও বিশেষ স্তর। ব্যাপক অভিভাবকত্ব সকল সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করে আছে। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের পরিচালক, তাদের জীবনের যাবতীয় সংকীর্ণতা ও প্রয়োজন পূরণে তিনিই সাহায্যকারী।

আর বিশেষ অভিভাবকত্ব মুমিন বান্দাদের জন্য। তিনি তাদেরকে সাহায্য, হিদায়াত, অনুগ্রহ ও দান করার মাধ্যমে তাদের অভিভাবক।

শেখ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ হলেন সেই অভিভাবক, বান্দারা ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে যার প্রিয় হয়, সম্ভাব্য সব ধরনের কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে যার নৈকট্য অর্জন করে, নিজের তদবিরে তিনি ব্যাপকভাবে সকল বান্দাকে পরিচালিত করেন এবং তাদের মাঝে নিজের ক্ষমতা কার্যকর করেন। আর বিশেষভাবে মুমিন বান্দাদের অভিভাবক হয়ে যান। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন, নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে গড়ে তোলেন, সকল কাজে তাদেরকে সাহায্য করেন।'[১]

---

[১] *তাফসিরুস সাদি* (তাইসিরুল কারিমির রাহমান), আবদুর রহমান নাসির সাদি, পৃষ্ঠা : ৭৫৩

ধূলিকণা

যদি বিশ্ব আমাদের ক্ষমতার চাইতেও বেশি চাহিদা দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রাখত, সেখানে আমরা কীভাবে বসবাস করতাম? যদি এ জগতে আমাদের সম্ভাব্য কাজের চাইতেও করণীয় কাজের পরিমাণ বেশি হতো, সেগুলো আমরা কীভাবে পালন করতাম? যদি এখানে আমাদের সাধ্যের বাহিরে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ থাকত, কীভাবে সেগুলোর মোকাবেলা করতাম?

মানুষ এই বিস্তীর্ণ জগতের বুকে এক ক্ষুদ্র ধূলিকণা মাত্র। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য, তাওফিক এবং সহজতা না এলে সে কবেই হারিয়ে যেত!

আল্লাহ যেহেতু আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা জানেন, তাই আমাদেরকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন। বরং ইবাদতের সর্বোচ্চ স্তর প্রকাশ পায় সর্বনিম্ন বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে! তাই তো আল্লাহ কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়াতে ইবাদতকে সাহায্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যে আয়াতটা আলিমদের ভাষ্যমতে কুরআনের পূর্ণ রহস্য পুরোপুরি ধারণ করেছে। আর সেটা হলো আল্লাহর বাণী—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই আমরা সাহায্য চাই।[১]

বান্দা ততক্ষণ বান্দা হতে পারবে না, যতক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য না করবেন।

বান্দা ততক্ষণ বান্দা হতে পারবে না, যতক্ষণ সে আল্লাহর কাছে সাহায্য না চাইবে।

বান্দা ততক্ষণ বান্দা হতে পারবে না, যতক্ষণ আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব না করবে।

মানুষের সাথে মানুষের বেলায়াত থাকে মিত্রতা বা সাহায্যের আকারে। কিন্তু মানুষ আর রবের মাঝে বেলায়াতের ক্ষেত্রে মানুষ ইবাদত করে আর রব সাহায্য, তদবির ও অনুগ্রহ করে থাকেন। সে কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ... ﴿٩﴾

[১] সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫

তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই।[১]

আল্লাহর বেলায়াতের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতার বিকল্প কেউ নেই। বান্দার জীবনে আল্লাহর তদবির, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিতেই হবে।

যুদ্ধের সূচনা

এই নামের মাহাত্ম্য হলো এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর অভিভাবকত্ব, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিরক্ষার ইঙ্গিত দেয়। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ বলেন, যে আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।'[২]

যে আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত, তিনি এক ভয়াবহ যুদ্ধের ঘোষণা দেন। এ যুদ্ধে তিনি এমন প্রত্যেককে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন যারা তাঁর বন্ধুদেরকে কষ্ট দেয়! কারণ তিনি তাদের বন্ধু। আর বন্ধু বন্ধুকে ছেড়ে দেন না! বরং নিজের ভালোবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে ঘিরে রাখে, তার দৃষ্টিসীমার মাঝে বড় করে তোলে, নিজের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলে!

যুদ্ধের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। যেখানে আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা, অহংকার, বড়ত্ব ও প্রতাপ নিয়ে আপনার বিপরীতে অবস্থান করেন! আপনার সাথে এমন ক্ষমতা দিয়ে যুদ্ধে জড়ান, যার কোনো সীমারেখা নেই। এমন জ্ঞান নিয়ে তিনি আপনার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, যেটা দুনিয়া-আখিরাত বিস্তৃত। তীব্র ক্রোধ নিয়ে তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আপনার ধ্বংস অনিবার্য। আপনার শোচনীয় পরাজয় হবেই!

একটা হাদিসে কুদসি আছে। হাদিসটার শব্দচয়ন অবাক করার মতো। একাধিক আলিম এটা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইবনু তাইমিয়া তার *আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া-আউলিয়াইশ শাইত্বন* বইতেও উল্লেখ করেছেন। নবিজি

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ৯

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫০২

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন, 'হিংস্র সিংহ যেভাবে প্রতিশোধ নেয়, আমি আমার বন্ধুদের পক্ষে সেভাবে প্রতিশোধ নিই।'[১]

শাইখুল ইসলাম বলেন, 'অর্থাৎ যারা তার সাথে শত্রুতা করে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রতিশোধ নিই, যেভাবে হিংস্র সিংহ প্রতিশোধ নিয়ে থাকে।'[২] যে লোকটা আল্লাহর কোনো বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তার কেমন ভয় করা উচিত! তার ধ্বংস আর ক্ষতি তো অনিবার্য!

তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন

জমিন যখন তৃষ্ণার্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসতে থাকে, মৃত্যুর দিকে যখন ধাবিত হতে শুরু করে, মানুষজন মুক্তির অপেক্ষায় যখন আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন 'আল-ওয়ালি' নামটার প্রকাশ ঘটে। তিনি মেঘমালাকে বৃষ্টি বর্ষণের অনুমতি দেন। তাঁর বান্দা এবং প্রিয় বন্ধুদের মাঝে নিজের রহমত ছড়িয়ে দেন।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

আর তাদের নিরাশ হওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; এবং তিনিই অভিভাবক, অত্যন্ত প্রশংসিত।[৩]

যখন ঘোর অমানিশা আপনাকে আচ্ছন্ন করে, আপনি এর আস্তরণ ছেড়ে বের হতে না পারেন, সত্য থেকে মিথ্যা, সঠিক থেকে ভুল আলাদা করতে না পারেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আপনাকে পেয়ে বসে, তখন আল-ওয়ালি তাঁর আলো দিয়ে সেই অন্ধকারকে আলোকিত করে দেন। অন্ধকারের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আপনি বাতিলের মধ্য থেকে সত্যকে চিনতে পারেন। অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসেন।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ ...﴿٢٥٧﴾

[১] ইবনু তাইমিয়া ও ইবনু কাসির রাহিমাহুমাল্লাহ এটিকে তাদের কিতাবে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করলেও হাদিসের মৌলিক কোনো উৎসগ্রন্থে আমরা এ হাদিসটি খুঁজে পাইনি।

[২] *আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া-আউলিয়াইশ শাইত্বন*, পৃষ্ঠা : ৮

[৩] সুরা শুরা, আয়াত : ২৮

আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান।[১]

সবসময় 'আল-ওয়ালি' নামটি আপনার জীবনে প্রকাশ পায়। আপনার জীবনকে নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ আর সৌভাগ্য দিয়ে আবৃত করে দেয়।

হৃৎকম্পন

আল্লাহ আপনাকে একটা কাজের আদেশ দেন। তারপর সেটা বাস্তবায়নের শক্তি দেন। এমনভাবে সাহায্য করেন যে, আপনার অন্তর কাজটা করার দিকে ধাবিত হয়। কাজটা করতে গেলে আপনার মনে প্রশান্তি আসে। আপনাকে আরও একভাবে তিনি সাহায্য করেন। সেটা হলো জীবনের সবকিছুকে আপনার সাথে মিলিয়ে দেন। ফলে জীবনের সকল কিছুর সাথে আপনি পূর্ণ সামঞ্জস্য খুঁজে পান।

আবার আপনাকে একটা কাজ করতে নিষেধ করেন। তারপর এমনভাবে সাহায্য করেন যে কাজটা আপনার জন্য কঠিন হয়ে যায়। কাজটা করার পথে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। কাজটা করতে গেলেই আপনার হৃৎকম্পন শুরু হয় এবং মনে অশান্তি তৈরি হয়। কাজে জড়িয়ে পড়লেও অনুশোচনার অনুভূতি এনে দেন যাতে আপনি আবার এটা না করেন। এই কাজ করলে শাস্তির ভয় দেখিয়েও আপনাকে সাহায্য করেন। নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে আপনার মনে এই অনুভূতি দেন যে, মহান রবের প্রতি সমর্পিত এই সামগ্রিক জীবনে আপনিই শুধু গোঁয়ারতুমি করছেন! এই অনুভূতি দিয়েও তিনি সাহায্য করেন।

তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত অভিভাবক। আপনার জীবনকে তাঁর সাহায্য যে আবৃত করে আছে, এটাও তাঁর বেলায়াতের উৎকৃষ্ট নমুনা।

সুরক্ষিত ঢাল

আল্লাহর অভিভাবকত্বের অন্যতম নিদর্শন হলো তিনি বান্দাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সৃষ্টির মাঝেই এমন কিছু জিনিস তাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন যেটা তাদেরকে জীবনে উপকার অর্জন এবং ক্ষতি দূর করার কাজে সাহায্য করে!

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৭

আল্লাহ পাখি সৃষ্টি করার পর তাকে ডানা দিয়ে সাহায্য করেছেন, যাতে সে সুউচ্চে উড়ে বেড়াতে পারে। হাতি সৃষ্টি করে তাকে বিশাল দেহ দিয়েছেন যাতে সে প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে পারে। ঘোড়া সৃষ্টি করে তাকে ছুটে চলার শক্তি দিয়েছেন, যাতে সে বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করতে পারে। হরিণ সৃষ্টি করে তাকে শক্ত শিং দিয়েছেন যাতে সেটা দিয়ে সে হিংস্র পশুর সাথে লড়তে পারে। গিরগিটি তৈরি করে তাকে নানান রং ধারণের ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে শিকার করতে পারে।

প্রতিটা প্রাণীর মাঝেই আল্লাহ এমন কিছু দিয়েছেন যেটা দিয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে। এমন কিছু তাকে দান করেছেন যেটা তার জন্য সুরক্ষিত দুর্গের মতো। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা ও সাহায্য করার জন্যই এমনটা করেছেন।

আল্লাহর অভিভাবকত্বের আরেকটা নমুনা হলো তিনি মাকে সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী করেছেন, যাতে সেই স্নেহের কারণে বাচ্চা জীবনে বাঁচতে পারে। কারণ স্নেহময়ী মা না থাকলে একটা দিনও নিজের ওপর নির্ভর করে একটা বাচ্চা জীবনধারণ করতে পারত না!

আপনি এমন বহু নারীকে দেখেছেন, জীবনের নানা পর্যায়ে যার দুর্বলতা আপনার সামনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখন তার ছোট বাচ্চাদের ওপর কেউ আক্রমণ করেছে, তখন সে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়ে বাচ্চাদের আগলে রেখেছে এবং তাদের পক্ষ নিয়ে তীব্র স্পৃহা দেখিয়ে লড়াই করেছে। এই যে পরিবর্তন, এটাও সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহর অভিভাবকত্বের অন্যতম নিদর্শন!

এতিম হয়েও আলিম

আল্লাহ যদি কাউকে আলিম বানাতে চান, তাহলে চারদিক থেকে তার জন্য সাহায্যের জানালা খুলে দেন যাতে করে সে জ্ঞানের আঙিনায় সহজে প্রবেশ করতে পারে!

এতিম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে আল্লাহ যখন আলিম বানাতে চাইলেন, তার মায়ের হৃদয়ে তাকে শেখানোর আগ্রহ তৈরি করে দিলেন। তাকে নিয়ে বাগদাদের ইলমি মজলিসে যাওয়া এবং ফিরে আসার ধৈর্য তাকে দিয়ে দিলেন!

তারপর তাকে এমন স্মৃতিশক্তি দিলেন, যার মাধ্যমে সে লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করে ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে!

তারপর তাকে এমন অনুধাবনশক্তি দিলেন, যার মাধ্যমে তিনি এক ফিকহি মাযহাবের গোড়াপত্তন করলেন। আজও সেই ফিকহি মাযহাব জীবন্ত!

তাকে আকিদাগত বিভ্রান্তি এবং রাজনৈতিক জুলুমের মুখে অবিচল থাকতে সাহায্য করলেন, যাতে তিনি সে যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতের ইমাম হতে পারেন। সুন্নাহর বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আহলুস সুন্নাহ নির্যাতিত হওয়ার পর যাতে করে মানুষজনের দ্বীন নতুনত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এটা একজন আলিমের উদাহরণ। এভাবে যদি আমরা এমন সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির তালিকা করতে যাই, হোক সে দ্বীনের আলিম অথবা ভাষাবিদ কিংবা বিজ্ঞানী, যাদের জ্ঞানে আল্লাহ জগৎকে আলোকিত করতে চেয়েছেন, তাহলে চিন্তা করুন তো কী অবস্থা হবে?

তাকে আপনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে দিন

দুআ কবুলও আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য অভিভাবকত্ব, ভালোবাসা ও সাহায্যের একটা রূপ!

এক লোকের ওপর নানা প্রকার বিপদ ও দুশ্চিন্তা ভর করেছিল। তিনি এক দাঈকে ফোন করে একের পর এক নিজের ওপর নেমে আসা বিপদগুলোর অভিযোগ করে চলল। শাইখ শুধু শুনছিলেন আর প্রভাবিত হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ছিলেন। ফোনকলের শেষভাগে লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাইখের কাছে সাহায্য চাইলেন। শাইখ বললেন, আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমাকে এই বিপদাপদ থেকে কোনোভাবে মুক্তি দিতে পারতাম, তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেবো, আশা করি এটার মাঝে আছে তোমার মুক্তির চাবিকাঠি, তোমার দুশ্চিন্তা লাঘবের উপায়! আমি চাই আজ গভীর রাতে রবের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। এক দীর্ঘ সিজদায় আল্লাহর কাছে সবকিছু খুলে বলবে, যেভাবে আমাকে খুলে বললে। তারপর আমাকে যেভাবে বিস্তারিত বললে, আল্লাহকেও সেভাবে বিস্তারিত বলবে। মাথা ওঠানোর আগে এমন কিছু বাকি রাখবে না, যেটা বলা হয়নি।' এরপর ফোন কেটে দিলেন শাইখ। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না লোকটা তার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে কতটুকু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শাইখ বলেন, এক সপ্তাহ পর লোকটা ফোন করল। তার কণ্ঠে আনন্দের সুর। কথাবার্তায় সুখানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিল। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। তার দুর্ভাবনা দূর হয়ে গিয়েছে। সে বলল, শাইখ! আল্লাহ আমার জীবনে আর কোনো দুশ্চিন্তা রাখেননি। এক সিজদায় আল্লাহ আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। এক বছর ধরে জমে থাকা সকল সমস্যা আল্লাহ এক সপ্তাহের

ব্যবধানে সমাধান করে দিলেন!

ফোনকল শেষ করার আগে সে বলল, শাইখ! আমি লম্বা করব না। কিন্তু আমি একটা জিনিস চাইব আপনার কাছে। যত মানুষ দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, বিপদাপদ নিয়ে আপনার কাছে ফোন দেবে, তাদের সবাইকে আপনি এমন লম্বা সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে সকল কিছু খুলে বলতে বলবেন। দুঃখ-কষ্টের রাতগুলোতে সে যে অশ্রু ঝরিয়েছিল, সেগুলোর বিবরণ দিতে বলবেন। সিজদা থেকে ওঠার আগে যেন কোনো কিছু আল্লাহকে বলা বাকি না রাখে। তারপর সে যেন কল্যাণের সুসংবাদের অপেক্ষা করে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .. ﴿١٨٦﴾

আর আমার বান্দারা যদি আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই।[১]

নেককারদের অভিভাবকত্ব করেন

আল্লাহর বাণীতে আছে—

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং নেককারদের অভিভাবকত্ব করেন।[২]

লাতায়িফুল ইশারাত প্রণেতা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করে, আল্লাহ তার যাবতীয় বিষয়ের অভিভাবকত্ব যথাযথভাবে করে থাকেন। তাকে অন্যদের দিকে ন্যস্ত করেন না। তাকে কোনো অবস্থার ওপর তিনি ছেড়ে দেন না। বরং সে যা চায়, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাকে সেটার ব্যবস্থা করে দেন।'[৩]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৯৬

[৩] *লাতায়িফুল ইশারাত*, কুশাইরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯৭

তাকে অন্যদের দিকে ন্যস্ত না করার অর্থ তাকে তারই মতো অন্যান্য মানুষকে মুখাপেক্ষী করেন না। বরং আল্লাহ তার সবকিছুর অভিভাবকত্ব করেন। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহর বাণী, 'তিনি নেককারদের অভিভাবকত্ব করেন'—এর ব্যাখ্যায় আলুসি বলেন, 'অর্থাৎ মহান আল্লাহর নীতি হলো তিনি তাঁর নেককার বান্দাদের সাহায্য করেন, লাঞ্ছিত করেন না।'[১]

যখনই আল্লাহর বন্ধুরা প্রয়োজন অনুভব করে, তখনই তাদের জন্য আল্লাহর এই নীতি কতই না মহান! বান্দার এমন কোনো মুহূর্ত কি অতিক্রান্ত হয়, যখন সে রবের মুখাপেক্ষী হয় না? সংরক্ষণ, সুপথপ্রাপ্তি আর সহায়তা সবকিছুতেই আল্লাহকে বান্দার প্রয়োজন হবেই!

আল্লাহ 'কিতাব অবতীর্ণ করেন' বলে যে বিশেষণ নিজেকে দিয়েছেন, সেটা থেকে বোঝা যায় যে, এই কিতাবই বেলায়াতের প্রমাণ। আবুস সাউদ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিলের মাধ্যমে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে এটাই বেলায়াতের দলিল।'[২] সুতরাং যে ব্যক্তি তার ইলম, জ্ঞান ও হিদায়াতপ্রাপ্তির মাধ্যমে কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে, সে প্রকৃত বন্ধু, সংরক্ষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

আল্লাহ যে সকল নেককারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তারা হলো এই কুরআনের অনুসারীরা। বান্দা জ্ঞান, আমল ও বিশ্বাসে কুরআনের যত কাছে আসবে, ততই আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

মুসলিমের জীবনে যত পরিকল্পনা আছে, তার মাঝে একটা পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সেটা হলো কুরআন মুখস্থ করা। কুরআনকে হৃদয়ে বিশেষ স্থান দেওয়া। কুরআনকে জিহ্বায় বেশি করে স্মরণ করা। বান্দা কখনো যেন কুরআন মুখস্থকে এই যুক্তিতে বাদ না দিয়ে দেয় যে, সে তালিবুল ইলম নয় অথবা তার বয়স হয়ে গিয়েছে কিংবা তার মাঝে অনেক ঘাটতি আছে। কুরআন মুখস্থ করা একটা মুসলিমের জীবনের সেরা প্রকল্প। সে পূর্ণ হিফয করতে পারুক কিংবা আংশিক হিফয করুক। এই কুরআন তার অন্তর আর চেহারাকে আলোকোজ্জ্বল করে। কুরআন মুখস্থের কাজে ব্যস্ত থাকা প্রমাণ করে যে আপনার জীবনে মহান আল্লাহই আসল ব্যস্ততা, পরম লক্ষ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়। কুরআন মুখস্থ

---

[১] *তাফসিরুল আলুসি* (রূহুল মাআনি), খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৬

[২] *তাফসিরু আবিস সাউদ* (ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা-মাযায়াল কিতাবিল কারিম), খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০৭

করলে সেটা কবরে আপনার একাকিত্বের সঙ্গী হবে, দুনিয়া-আখিরাতে আপনার মর্যাদা সমুন্নত করবে। কুরআন মুখস্থ করার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। কুরআন মুখস্থ করার জন্য আলাদা কোনো যোগ্যতাও লাগে না! একমাত্র যোগ্যতা হলো মুসলিম হওয়া। আপনি যদি মুসলিম হন, তাহলে আপনার হৃদয়ে আল্লাহর কুরআন ধারণের জায়গা রাখুন। তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার জীবন রঙিন হয়ে উঠবে। এই লাইনগুলো পড়া শেষ করার পরই দৃঢ় সংকল্প করে ফেলুন যে আজ থেকে কুরআনের সাথে নতুন জীবন শুরু করবেন। আল্লাহর সাহায্য এবং প্রশংসিত অভিভাবক সেই মহান সত্তার সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর সম্মান, হিদায়াত ও স্পষ্টতম আলোর অপেক্ষায় থাকুন।

আল-ক্বওয়ি

কতই না মহান সে সত্তা যিনি দুর্বলতাকে মানুষের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য করে দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত জীবনের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য করে দিয়েছেন! অসুস্থতা তাকে দমিয়ে ফেলে, দারিদ্র্য তাকে পরাভূত করে আর আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মাঝে ক্ষমতার অধিকারীরা তাকে বশীভূত করে। অন্যদিকে শক্তিমত্তা, অহংকার, মাহাত্ম্য—এগুলো আল্লাহ নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন; যাতে দুর্বলেরা তাঁর কাছে আশ্রয় চায় আর তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। ভঙ্গুর মানুষেরা যেন তাঁর শরণাপন্ন হয়, আর তিনি তাদের ব্যথার উপশম করেন। বিপদগ্রস্তরা যেন তাঁর দিকে ছুটে যায় আর তিনি তাদের থেকে বিপদ দূর করেন।

তিনি প্রবল শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। তাঁর শক্তির বিপরীতে কোনো শক্তি টিকতে পারে না। তাঁর প্রতাপের দরজার সামনে সকল ক্ষমতাধরই দুর্বল। সকল অহংকারী তাঁর বাদশাহির প্রাসাদের সামনে নিঃস্ব।

আসুন আমরা একটা জানালা খুলে তাঁর শক্তিমত্তার কিছু নজির দেখে নিই। আমাদের হৃদয়কে তাঁর ভীতি ও ভালোবাসায় ভরপুর করে নিই। জীবনের যে সকল ছোটখাটো বিষয়কে আমরা বড় মনে করেছিলাম, সেগুলোতে সামান্য মনে করতে শিখি!

তাই জীবনে আমরা যদি কাউকে খুব অহংকার করতে দেখি, বুঝে নেব সে নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছে। আল্লাহ তাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই সে নিজেকে নিয়ে এত কিছু ভাবছে! আল্লাহ চাইলে তার অহংকারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারেন। আর সেটা ক্ষুদ্রতম কীট দিয়ে, অদ্ভুতভাবে শেষ করে দিয়ে, তীব্র পীড়া দেওয়ার মাধ্যমে; আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধগ্রহণকারী।

আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই

আল্লাহর নাম 'আল-ক্বওয়ি'র ছায়ায় থাকলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাকেই শক্তি দান করেন, যে তাঁর কাছে শক্তি চেয়ে নেয়। তাঁর শক্তিমত্তা থেকেই সকল শক্তি গৃহীত হয়, যেগুলো মুসলিমকে তার ইবাদতসমূহের পাশাপাশি জীবনের সকল দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে।

একজন লোক নিজের জীবনে দুর্বলতার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারছিলেন না। একটা চেয়ারে করে তিনি সাঈ করতেন। এই চেয়ারটা তাকে পেছন থেকে ঠেলে দেওয়া হতো। এক-দুটি উমরা নয়, প্রায় পাঁচটি উমরায় তিনি এমন করেন। কিন্তু তিনি কোনো সংশয় ছাড়াই আল্লাহর শক্তিতে তার বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন শক্তি শুধু আল্লাহর থেকেই নিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসেও কখনো ঘাটতি দেখা দেয়, আবার কখনো বিশ্বাসের দৃঢ়তা বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে অন্তরে কঠিনতার স্তর পড়ে যায়। তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা করছেন, কোনো এক রমাদানে এক শাইখের মুখে 'লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' জিকিরটা শুনি। যিনি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এই জিকিরটা পড়েন, তার মাঝে এক অদ্ভুত শক্তি ভর করে। সকল ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারাটাও আল্লাহরই দান। এই জিকিরটা যেন উক্ত শক্তিকে চেয়ে নেওয়ার মতো!

শাইখের বক্তব্যটা তার খুব মনে ধরে। তার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তিনি এতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। তারপর থেকে তিনি জিকিরটা নিয়মিত পড়তে থাকেন। জিকিরটি দিয়ে হৃদয়কে তিনি ধুয়ে ফেলেন।

জিকির করতে দেরি হয়নি, শক্তিমান আল্লাহ তার শরীরে নানা প্রকারের শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা দিয়ে দেন। এমনকি তিনি সে বছরের রমাদান মাস এবং তার পরবর্তী মাসে তিন-তিনবার উমরাহ করেন। প্রতি উমরাতে তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়াতেন। তাকে ঠেলার মতো হুইল চেয়ারের প্রয়োজন হয়নি। বরং আগে তার কারণে যে মানুষগুলোর দেরি হতো, এবার তিনি তাদেরকে ছাড়িয়ে দ্রুত উমরা করে ফেললেন এবং দেরি করার দায়ে তাদেরকে দায়ী করতে লাগলেন!

আল্লাহর শক্তি থেকেই শক্তি চেয়ে নিতে হয়। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সামনে সকল বেদনা, যন্ত্রণা ও ব্যথা দূর হয়ে যায়। কারণ শক্তিমান সত্তাই একমাত্র সত্তা, যিনি আপনাকে শক্তিশালী করে তোলেন। ফলে আপনি শারীরিক দুর্বলতা, অন্তরের ভঙ্গুরতা ও মনের ভেঙে পড়াকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

বিশাল বাতি

আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিন-রাতের প্রান্তে তাঁর শক্তিমত্তা দেখিয়ে দেন। এমনকি আপনি আপনার শরীরের প্রতিটি অণু সেই শক্তি দিয়ে ভরপুর করে নেন। আপনার মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি ভয় থাকে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভরতা থাকে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি আপনার মুখাপেক্ষিতা থাকে না।

তিনি জগতের নিয়মকানুনকে এমন করে দেন যে, কোনো কিছু বহন করা হলে সেটার অবশ্যই বাহক লাগবে। খড়কুটো জমিন থেকে ততক্ষণ উঠতে পারবে না, যতক্ষণ কেউ হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে না নেবে। আপনার মন যখন এই নিয়মকে পুরোপুরি মন থেকে গ্রহণ করে নেবে, পদার্থবিজ্ঞানের এই মূলনীতিকে মেনে নেবে, তখন আল্লাহর শক্তি আপনাকে থমকে দেবে। পদার্থবিজ্ঞানের মূলনীতি ও বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যাবে। আপনি দেখতে পাবেন এক বিশাল সূর্য, যেটাকে কারও হাত বহন করছে না। জগতের বুকে দৃশ্যমান এই শিক্ষা আপনাকে সেই মহান শক্তিধর আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী করবেন, যার একটা মাত্র শব্দে 'কুন' (হও) সূর্যের মতো বিশাল আকৃতির একটা বাতি সুউচ্চে নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে।

আপনি শুধু চেয়ে দেখুন বহু দিকে বিস্তৃত আঙিনার অধিকারী এই বিশাল আসমানের দিকে। আসমানটা কোনো খুঁটি ছাড়াই কীভাবে উত্থিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আপনি সেটা ভুলে যাবেন না—

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

> আর আসমান, আমি তা নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি নিশ্চয়ই মহাসম্প্রসারণকারী।[১]

আয়াতের 'আইদ' শব্দটা শক্তি বোঝায়। আপনি চিন্তা করুন তো, যে শক্তি এই আসমানকে সংরক্ষিত ছাদ বানিয়েছে, তাঁর বিপরীতে কে দাঁড়াতে পারে?

যে মানুষটা নিজের ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করে থাকে, তার প্রকৃত অবস্থা যদি আপনি দেখতে চান, তাহলে একটু চিন্তা করুন খুঁটি ছাড়া আসমান তৈরি করার মুরোদ কি তার আছে? তাহলেই আপনার কাছে রাজাধিরাজের সামনে তার দুর্বলতা ও

---

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭

ভঙ্গুরতা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি অসুস্থ

সৃষ্টিকর্তার শক্তিমত্তা বুঝতে হলে একজন মানুষকে অসুস্থতার সময় নিজের দুর্বলতা ও নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবতে হবে!

জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তার অন্যতম একটি হলো অসুস্থতা। হোক সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা কিংবা পীড়াদায়ক কোনো ফোঁড়া। অসুস্থতা মানেই ভিন্ন আবহ তৈরি হওয়া। সেটা যন্ত্রণা আর অক্ষমতায় ভরপুর।

আল্লাহ এই দুনিয়ায় মানুষকে বহু রোগে আক্রান্ত করেন যাতে এই জীবনে মানুষ তার অক্ষমতার ঘোষণা দেয়। আর মহান শক্তিমান আল্লাহর সামনে নিজের মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করে নেয়। সে যেন কোনো শক্তিমত্তার অনুভূতিতে উন্মাদ না হয়ে যায়, কারণ রোগ তাকে দুর্বল করে দেবেই। সে যেন অর্থসম্পদ পেয়ে আত্ম-অহমিকায় না ভোগে। কারণ অসুস্থতা তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেবেই। সে যেন কোনো গোত্রীয় বা বংশীয় মর্যাদায় আত্মতুষ্টিতে না ভোগে। কারণ অসুস্থতা এই সবকিছুকে নিঃশেষ করে দেবে।

শিশুর শরীরে তাপমাত্রা যদি বেড়ে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়, তাহলেই তার শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। এটা অনেক সময় মৃত্যু বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

একজন বয়স্ক মানুষের শরীরের তাপমাত্রা যদি বারবার বেড়ে যায়, তাহলে কখনো সে চেতনা হারিয়ে বসে। এমন সব অনর্থক কথাবার্তা বলতে থাকে, যেগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই!

পরিবারের যে কোনো সদস্য চিকেনপক্সে আক্রান্ত হলেই পুরো পরিবারের সবার মাঝে সেটা সংক্রমণ করে। হে মানুষ, তুমি যে কতটা দুর্বল!

অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে গর্ভে থাকা সন্তানের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায়। এর প্রভাবে সে অনেক সময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন কিংবা অদক্ষ হয়ে জন্মায়।

মানুষ যদি চিৎ হয়ে উঁচু কোনো জায়গা থেকে পড়ে যায় এবং তার মেরুদণ্ডে আঘাত পায়, তাহলে এক আঘাতে তার পূর্ণ বা আংশিক পক্ষাঘাত হয়ে যেতে পারে!

হঠাৎ একঝলক ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ একজন মানুষের ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস

ঘটিয়ে দিতে পারে, যাতে তার মুখের অর্ধেক বাঁকা হওয়ার সাথে অবশও হয়ে যাবে।

দাঁতের ব্যথা, কানের ব্যথা কিংবা মাথার ব্যথায় একজন মানুষ হয়তো টানা কয়েক রাত ঘুমাতে পারে না!

পেপটিক আলসার একজনের জীবন জাহান্নাম করে দিতে পারে! একটা খাবার খাওয়ার পর সেটার ব্যথায় কোঁকড়াতে গিয়ে ব্যক্তির সারা রাত চলে যায়!

কয়েক বছর আগে আমার বড় ভাই আমাদের গোত্রের এক বড় ভাইকে নিজের বাসায় রেখেছিলেন। লোকটা ক্যান্সারে আক্রান্ত। এদিকে যে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের শহরে। তিনি প্রতিদিন হাসপাতালে গিয়ে ভাঙা শরীর নিয়ে রাতে ফিরতেন। আমার মনে পড়ে তিনি তার ছেলেদের বলতেন, 'আমি কবে মরব?' অর্থাৎ তিনি যেন এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন!

আমার দাদির হারপিস জোস্টার নামে এক চর্মরোগ হয়েছিল। এটা ভয়াবহ একটা রোগ। চামড়ায় এত ব্যথা করে যেন চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। ৭ বছরের বেশি সময় ধরে তার এই রোগ ছিল। তিনি সবসময় মৃত্যু কামনা করতেন। যেকোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়ে যাক এমনটা চাইতেন। জাহান্নামতুল্য কষ্ট থেকে মুক্ত হতে চাইতেন!

অহংকারীদের তিনি অবদমিত করেন

নমরুদ ইবনু কিনআন। সে দাবি করেছিল সে জীবন ও মৃত্যু দিতে পারে। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিতে একটি মশা লাগিয়ে দেন। মশাটি তার নাক দিয়ে মাথায় ঢুকে পড়ে। তারপর মাথার ভেতর এত বেশি ডানা ঝাপটাতে থাকে যে, তার মনে হয় দুনিয়ার সব ব্যথা তার ওপর চড়াও হয়েছে। ব্যথা কমানোর জন্য তাকে জুতা দিয়ে মাথায় আঘাত করা লাগত! কেন সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না? সে তো দাবি করেছিল, সে জীবন আর মৃত্যু দেয়!

যে নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু দাবি করেছিল, তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। যে দাবি করেছিল, নিজের জ্ঞানের শক্তিতে সে এত ধন-সম্পদ লাভ করেছে, আল্লাহ তাকে এবং তার বাড়িকে জমিনে ধসিয়ে দিলেন। যে বলেছিল, 'আমি আমার মনের মন্ত্রণায় আল্লাহর দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠি মাটি নিয়েছিলাম', সে এক মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তার শেষ পরিণতি হয়েছিল এমন যে, সে মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে বলত, 'আমাকে স্পর্শ কোরো না! আমাকে স্পর্শ কোরো না!'

জার্মান দার্শনিক নিৎশে ঘোষণা করেছিল, আল্লাহ মারা গেছেন! (নাউজুবিল্লাহ!

আল্লাহ মৃত্যু থেকে পবিত্র!) তারপর সে পাগল হয়ে গেল। শেষ জীবনে এক মানসিক হাসপাতাল থেকে অন্য মানসিক হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে তার মরণ চলে এলো! মানসিক ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় সে অনেকগুলো বই লিখল। এমনকি তার বিখ্যাত বই *দাস স্পোক যারাথুস্ট্রা* বইয়ের তিন-তিনটা অধ্যায় লেখার সময় তার মাথায় নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা আসছিল, যেগুলোর বাস্তব রূপ সম্পর্কে সে কিছুই জানত না!

কে তাকে শেষ জীবনে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলো? কার ফয়সালায় সে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিয়ে করতে পারল না? কার কারণে সে হতভাগা বিড়ালের মতো রোগীর বিছানায় গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকল? তিনি আল্লাহ। তাঁর আদেশেই সবকিছু হয়।

পরম শক্তিমান আল্লাহ মাঝে মাঝেই তার অলৌকিক কাজগুলোর প্রকাশ ঘটান, যাতে বান্দাদের দুর্বলতা এবং মুখাপেক্ষিতা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। তারা যে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান থেকে কতটা দূরে সরে গেছে সেটা তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন। কিছু সমাজে প্রকাশ্যে অনৈতিক কাজকর্ম সংঘটিত হয়। ফলে সে সমাজগুলোতে এমন সব রোগ দেখা দেয়, যা আগে কখনো শোনা যায়নি। যেমন, এইডস, যে রোগে শুধু অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত ব্যক্তিরাই আক্রান্ত হয়। তাদের শরীরে রোগের প্রকাশ ঘটার আগে স্বপ্নেই রোগটা প্রকাশ পায়। অদ্ভুত এই রোগ, যার কারণে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শূন্য হয়ে যায়। সামান্য রোগ হলেই মানুষ মারা যায়। জীবনের শেষ মুহূর্তটা তাকে বেশ কষ্টে কাটাতে হয়। সর্বত্র মৃত্যুর ছায়া তার সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

...وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ... ﴿١٣﴾

তথাপি তারা আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে।[১]

ডোজ

আমার ভাইয়ের কিডনিতে পাথর হয়েছিল। সাদা বিছানার ওপর তার শরীর দেখে আমার খুব কষ্ট লাগত। আহত পাখির মতো ভঙ্গুর অবস্থায় সে বিছানায় পড়ে থাকত। কিছুই করতে পারত না। ব্যথা তাকে কুঁকড়ে দিয়েছিল। তাকে দেখে আমার

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ১৩

যে এত কষ্ট লাগত। আমার মনে চাইত তার সাথে যদি কষ্ট ভাগ করে নিতে পারতাম, তাহলে তার বেদনা কমত!

আমার এক বন্ধু ভুলে একটা ঔষধ এক ডোজ বেশি খেয়ে ফেলে। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় সে যেভাবে ছটফট করছিল, তার কপালের রগ যেভাবে ফুলে গিয়েছিল, সেটা দেখার পর আমি কল্পনাই করতে পারছিলাম না, জ্যাঁ পল সার্ত্রের মতো কোনো ব্যক্তি কীভাবে মানুষের প্রভুত্ব দাবি করে! যে প্রভু নিজের শরীরের ব্যথা সামলাতে পারে না, তার কী মূল্য!

তারা কি শক্তিমান আল্লাহ তাআলাকে ত্যাগ করে এমন কিছুর কাছে উপাসনার জন্য যায়, যে নিজের কোনো উপকার, ক্ষতি, জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখে না?

বিশাল পর্বতমালা

মানুষের হৃদয়ে কোনো কিছুর অবস্থান যত বড় হয়, সে যখন অহংবোধের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে, তখনই আল্লাহ কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করে তার অহংকারকে নিঃশেষ করে দেন! এই অহংকার হয়ে পড়ে অস্তিত্বহীন!

মক্কার মুশরিকদের কাছে পাহাড়গুলো বেশ বড় মনে হচ্ছিল। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকে পাহাড়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগল। তারা মনে করেছিল পাহাড়ের বড়ত্ব নিয়ে তারা উদাহরণ পেশ করবে। কিন্তু স্রষ্টার শক্তি তাদের মনে থাকা এই অনুভূতিকে নড়বড়ে করে দিলো। যে আল্লাহ সুস্পষ্ট সত্য, তিনি বললেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

> আর তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে, যাতে আপনি উঁচু-নিচু দেখবেন না।[১]

যে পাহাড় তাদের মনে বেশ বড় জায়গা করে নিয়েছিল, সেটাকে আল্লাহ পুরোপুরি

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১০৫-১০৭

উৎপাটিত করে দিলেন। ধূলিকণায় রূপ দিলেন যা খুবই দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু!

সুবিশাল সমুদ্রকে আল্লাহর শক্তি আগুনের রূপ দান করে!

সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত আল্লাহর কুদরতে মেঘ হয়ে যায়!

সূর্য আর চাঁদ আল্লাহর মাহাত্ম্য আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়!

সবচেয়ে শক্তিশালী যে জিনিসটার পেছনে দাঁড়িয়ে আপনি আত্মরক্ষা করতে পারেন, যে জিনিসটা আপনার দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে পারে, ভয়াবহ এই বিশ্বে আপনার একমাত্র নির্ভরতার মাপকাঠি হতে পারে, সেটা হলো আল্লাহর শক্তি!

রোগে-শোকে যদি আপনি ভীত হয়ে পড়েন, তাহলে শক্তিমানের আশ্রয় নিন!

চারদিক থেকে ভীতি যদি আপনাকে নড়বড়ে করে দেয়, তাহলে শক্তিমানের ওপর ভরসা করুন!

জুলুম যদি আপনার শক্তিকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়, তাহলে শক্তিমানের কাছে সাহায্য গ্রহণ করুন!

মশা

অহংকারীদেরকে আল্লাহ বিস্ময়কর সমাপ্তি দেন। সবচেয়ে অদ্ভুত রোগের মাধ্যমে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ বেদনা তার জন্য বরাদ্দ রাখেন। এতে দুর্বলরা বুঝতে পারে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সর্বশক্তিমান। তিনি ছাড়া আর সবকিছু দুর্বল ও ভঙ্গুর!

আপনি কি জানেন আল্লাহ কীভাবে নমরুদ ইবনু কিনআনের কাহিনির সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন? তীব্র অহংকার নিয়ে সে বলেছিল—

...قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ... ﴿٢٥٨﴾

আমি জীবন দিই, আমি মৃত্যু দিই।[১]

একটা মশা নাক দিয়ে ঢুকিয়ে আল্লাহ তাকে শেষ করে দেন। ক্ষুদ্র ডানা দিয়ে মাথার খুলিতে অনবরত আঘাত করে চলল। সে কঠিনতম বেদনায় ভুগতে ভুগতে সবচেয়ে দুর্বল গাধার মতো মারা গেল!

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৮

আপনি কি জানেন আল্লাহ কীভাবে ফিরাউনের কাহিনির শেষ অধ্যায়টা বর্ণনা লিখেছেন? যে ফিরাউন একদিন বলেছিল—

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু।[১]

যে ফিরাউন অহংকারের বশবর্তী হয়ে মন্ত্রী হামানকে বলেছিল আল্লাহকে দেখার জন্য একটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে! পরম শক্তিমান আল্লাহকে দেখার জন্য প্রাসাদ! আপনি কি জানেন আল্লাহ তার কী অবস্থা করলেন? সব দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ তাকে ঘিরে ফেলল, সে ডুবে মারা গেল। মাছের খাদ্যে পরিণত হলো! এককোষী প্রাণীর খাবার বানিয়ে দিলেন তাকে!

তাঁর শক্তিমত্তা ও মাহাত্ম্যের অন্যতম নিদর্শন হলো তিনি তাঁর শত্রুদেরকে নিজেদের মাধ্যমেই পিষে ফেলেন, জীবনের সমাপ্তি টেনে দেন। তাদের জীবনের নথিপত্রে শেষ বিন্দুটা তাদের হাত দিয়েই দেন!

এডলফ হিটলার নামের এক অহংকারী বিশ্ব-দখলের সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হয়। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে থাকে। একের পর এক রাষ্ট্র তার পদানত হয়। সে এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধের কারণ হয়, যার ফলে ৭০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়!

প্রবল শক্তিমান আল্লাহ কী করেছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি 'আতঙ্ক' নামের এক সৈনিক পাঠিয়ে দিলেন। সব দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলল সেই 'আতঙ্ক'। মনের গভীরে থাকা অহমিকা আর মেকি বড়াই টেনে বের করে নিল। সে মরণঘাতী বিষ খেয়ে 'হিটলার' নামের রূপকথার অবসান ঘটিয়ে দিলো! যে হিটলারকে পরাজিত করা যাচ্ছিল না, যে হিটলার সারা বিশ্ব নিজের কর্তৃত্বে নিতে চেয়েছিল, সে নিজের ভয়ের কাছে পরাজিত হলো! নিজেই নিজেকে হত্যা করে বসল। আপনি কি জানেন কেন সে এমন করল? কারণ সে প্রবল শক্তিমান আর মহাপরাক্রমশালী নয়। আল্লাহ তাকে দুর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট কোনো কিছুর পক্ষে শক্তিমান হওয়া অসম্ভব!

যুগে যুগে যারাই কখনো নিজেদের শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও মেধাবী দাবি করেছে,

[১] সূরা নাযিআত, আয়াত : ২৪

তারা সবাই আজ মারা গিয়েছে। এক সময় তারা ছিল প্রকৃত সত্তা, আজ শুধু তাদের চিহ্ন বাকি আছে। আল্লাহ তাদের সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। তারা 'কাহিনি'তে পরিণত হলো! তারা আজ শুধু গল্পের বিষয়। রাতের বেলা বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য তাদের আলোচনা আনা হয়। তাদের সুবিশাল প্রাসাদ, বিশাল আঙিনা আর ক্ষমতাধর বাহিনী সব চলে গিয়েছে বারযাখের বৃহৎ জগতে, যেখানে আল্লাহ অহংকারীদের একত্র করেন। তারপর তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি মিটিয়ে দেন। আর আল্লাহ খুব দ্রুতই হিসেব করেন।

তাঁবুগুলোর মাঝে

উমাইয়া খলিফা সুলাইমান ইবনু আব্দিল মালিক হজে বের হলেন। তার সাথে ছিলেন উমর ইবনু আব্দিল আযিয। সুলাইমান তায়েফ অভিমুখী হলে আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সুলাইমান ভড়কে গিয়ে উমরকে বললেন, 'আবু হাফস, এটা কী?' উমর বললেন, 'আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তার ক্রোধ নেমে আসার সময় হলে কী অবস্থা হতো!'[১]

দুনিয়ার এক সফরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হলেন সুলাইমান। তিনি দুনিয়ার রাজা। দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশাহ তাকে ভয় করে চলে। তার নাম শুনলে গণ্যমান্য লোকদের মনেও কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বের হলেন, যে বাহিনীর শেষ দেখা কঠিন। কোনো এক রাতে শরীরে ব্যথা উঠল। ডাক্তাররা দেখে সিদ্ধান্ত নিল তিনি 'মৃত্যু' নামক রোগে আক্রান্ত। তার আর বেশি দিন নেই! খিলাফতের রাজধানী দামেস্কে পৌঁছানো তার জন্য কঠিন। এক রাতে তার ব্যথা অনেক বেড়ে গেল। নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলেন তার সৈনিকদের তাঁবু। চোখ যতদূর যায়, সবাই তার সৈনিকদের তাঁবুতে ভরপুর। আসমানের দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তিনি বললেন, 'ওহে সেই সত্তা, যার রাজত্বের অবসান হয় না! দয়া করুন এমন সৃষ্টির প্রতি, যার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়।'

তাঁর শক্তির সমান কোনো শক্তি নেই। তাঁর রাজত্বের সমান কোনো রাজত্ব নেই। তাঁর রাজত্ব কখনো বিলুপ্ত হয় না। তাঁর শক্তি কখনো বদলে যায় না। তাঁর বড়ত্ব কখনো শেষ হয়ে আসে না।

সুলাইমান ইবনু আব্দিল মালিক রাহিমাহুল্লাহ ভাবেননি যে, তার সব নির্দেশ সবাই মেনে নিলেও প্রয়োজনের সময় তিনি সুস্থ হতে পারবেন না। কখনো তার কল্পনায়

---

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া-তাবাকাতুল আসফিয়া*, আবু নুআইম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৮

আসেনি যে এত বড় রাজ্যের মালিক হয়েও তাকে একটা তাঁবুতে মরতে হবে! তিনি ভাবেননি যে, যেসময়টায় তিনি লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন, এ সময়টি একবারে কাছাকাছি!

মহান আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ রাহিমাহুল্লাহ মেঘ দেখলে বলতেন, 'তোমার যেখানে ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণ করো, তোমার বর্ষণ থেকে যে ফসল গজাবে, সেটার কর আমার কাছে আসবে!'

এই খলিফা নিজের স্বর্ণালী বারান্দা ও প্রশস্ত আঙিনা সম্বলিত প্রাসাদে থাকতেন। হঠাৎ মৃত্যু তার কাছে এসে হাজির। তিনি তুলতুলে বিছানা ও বালিশে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ার পর থেকে বিদায়ের দুশ্চিন্তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দজলা নদীতে এক হতদরিদ্র ধোপা কাপড় ধুচ্ছে আর মনের সুখে গান গাইছে। প্রাসাদের জানালায় সেই গান ভেসে আসতে লাগল। হারুনুর রশিদ গান শুনলেন। যে হারুনুর রশিদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং বিশাল রাজত্ব, তার দাড়ি ভিজে গেল অশ্রুতে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হায়! আমি যদি একজন ধোপা হতাম। হায়! আমি যদি খিলাফত না চিনতাম।'

প্রবল শক্তিমান আল্লাহ তাআলা এমন ক্ষমতাবান মানুষেরও দুর্বল মৃত্যু রেখেছেন, যাতে আমরা মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি। ফলে আমরা কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই।

সে মারা গেল!

আমার এক বন্ধু তার পুরাতন প্রতিবেশীর ঘটনা বলেছিল। প্রতিবেশী একটা বড় মহল্লায় থাকত। খুব প্রতাপশালী ও অত্যাচারী ছিল সে। তার শারীরিক গঠন সুদৃঢ়। শরীরের মাংসপেশী লোহার মতো শক্ত। ঘটনাটা অনেক পুরাতন। আমার বন্ধুটা আজও বেশ দুর্বল, শারীরিক গঠনে এবং বুদ্ধিমত্তায়!

মহল্লার কিছু লোকজন আমার বন্ধুর নামে মিথ্যা অভিযোগ তোলে যে, ঐ প্রতিবেশী যখন বাড়িতে থাকে না তখন আমার বন্ধু নিজের বাড়ির ওপর থেকে তাদের বাড়িতে চোখ দেয়!

একদিন মহল্লার এক গলিতে দুজনের দেখা হলো। জালিমটা আমার বন্ধুকে দেখেই তার ওপর চড়াও হলো। তাকে বেদম প্রহার করে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করল। বন্ধুর ভাষায়, 'আমার কান্নার বয়স অনেক আগে চলে গিয়েছে। তবু সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সরাসরি মসজিদে চলে গেলাম।'

যেন মসজিদেই নিরাপত্তা নেমে আসে, সাহায্য তিনি মসজিদেই পাবেন!

'আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম। পুরো দুই রাকাতজুড়ে চোখের পানি ঝরল। শক্তিমান পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্য চাইলাম!'

বেদনা, যন্ত্রণা, কষ্ট এবং লাঞ্ছনার অনুভূতি আমার বন্ধুকে আহত পাখির মতো করে দিয়েছিল। তার যদি আত্মরক্ষার শক্তি থাকত, তাহলে মাংসপেশীর শক্তির ওপর সে নির্ভর করত। মানুষের সামনেই তাকে লাঞ্ছিত করত।

'পা টানতে টানতে বাড়িতে ফিরে গেলাম। চারদিক থেকে লাঞ্ছনা আমাকে ঘিরে রাখল। জুলুমের অনুভূতি, কিছু করতে পারার অক্ষমতা এবং মানুষের কাছে অপদস্থ হওয়ার বিষয়টা আমাকে তাড়া করতে লাগল। আমি ঘুমানোর জন্য শুয়ে গেলাম।'

ফজরের আযানের ঠিক আগে তার ভাই তাকে জাগিয়ে দিলো। তাকে একটা খবর দিলো, 'জানিস, অমুক মারা গিয়েছে!' মানে ঐ দীর্ঘদেহী বৃহৎ মাংসপেশীর অধিকারী জালিমটা মারা গিয়েছে!

মারা গিয়েছে!

এভাবে মারা গিয়েছে?

তার মানে প্রবল শক্তিমান তখন তার দুআ শুনছিলেন? তিনি সবকিছু দেখছিলেন? সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলেন? তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, তাই এই ছেলের সব দুআ তিনি বাস্তবায়ন করে দিলেন!

দুনিয়াতে যত শক্তিধর আছে, তার চাইতে আল্লাহ বেশি শক্তিশালী। দুনিয়াতে যত পরাক্রমশালী আছে, তাদের সবার তুলনায় তিনি মহা পরাক্রমশালী।

যখন হৃৎপিণ্ড থেমে যায়

আমার এক বন্ধু তার একটা ঘটনা বলে। এই ঘটনার সাথে তার পরিবারের সদস্যরা জড়িত। ঘটনার শুরু তার গর্ভবতী বোন ও বোনের স্বামী থেকে। তারা একটা গাড়িতে করে তাবুক শহরের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনো একটা ক্রসিংয়ে অন্য পাশ থেকে আসা একটা গাড়ি রাস্তায় লাল সিগনাল থাকা সত্ত্বেও ঢুকে পড়ে এবং এমন জোরে আঘাত করে যে আমার বন্ধুর বোন ও তার গর্ভে থাকা বাচ্চা সেখানেই মারা যায়।

ঘটনার কিছুদিন পরে আদালতে বিচার বসে। গাড়ির ড্রাইভার সেই উদ্ভ্রান্ত যুবক এক মিথ্যা সাক্ষী নিয়ে হাজির হয়। সাক্ষী দাবি করে নিহত মহিলার স্বামীই সিগনাল অনুসরণ করেনি। বিচারক তাকে সাক্ষ্য লেখার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেয়। তাহলেই

মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। পরিবারের সদস্যরা ধরেই নিল যে এক উদ্ভ্রান্ত যুবক আর তার মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বোনের রক্ত বৃথা যাবে!

বন্ধুর ভাষায়, যেদিন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ছেলেটা আসবে, সেদিনের আগের রাতে পরিবারের সদস্যরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মিথ্যা সাক্ষীর বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত বদ-দুআ করবে। এমন অন্যায় বিচার প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর সাহায্য সবার বড্ড বেশি প্রয়োজন!

পরদিন সকালে আমরা আদালতে ছিলাম। বিচারকের কাছে গিয়ে দেখি উদ্ভ্রান্ত ছেলেটা সত্য স্বীকার করে নিচ্ছে। বিচারকের কোনো চাপ প্রয়োগ করতে হয়নি। কী ঘটছে সেটা আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখতে লাগলাম। তার কথা পরিবর্তনের রহস্য কী সেটা বিচারক জানতে চাইল। যুবক তাকে জানাল যে, সাক্ষী গতকাল রাতে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে!

নিশ্চয় এটা প্রবল শক্তিমান আল্লাহ! তিনি ঐ রাতে জুলুমে নিষ্পেষিত কিছু হৃদয়ের বিনীত, একনিষ্ঠ ও অশ্রুমাখা দুআ শুনতে পেয়ে যেন বলে ওঠেন, আমার মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি দুআয় সাড়া দেবো। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নির্দেশে ঐ জালিমের হৃদযন্ত্রের একটা শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সাথে একটা পরিবারের দুঃখ-কষ্টেরও অবসান ঘটে। হৃদযন্ত্র পূর্ণ বিনয়ের সাথে পরম প্রতাপশালী এক আল্লাহর সামনে অবনত হয়।

আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কুফরি করল

ইতালির এক প্রাচীন নগরী ছিল। নাম তার পম্পেই। বিশাল দালান-কোঠায় ভরপুর। সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। ইতিহাসবিদরা যখন এই নগরীর প্রাচুর্য নিয়ে কথা বলেন, তখন নমুনা দেন যে, এই নগরীর অলিগলিতে স্বর্ণ ছুড়ে ফেলে রাখা হতো, কারণ নগরবাসীর প্রয়োজন হতো না! কিন্তু তারা কি তাদের রবের শুকরিয়া করেছিল? স্বভাবতই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে—

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

যখন সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।[১]

[১] সুরা আলাক, আয়াত : ৭

...কিন্তু তাদের সীমালঙ্ঘন বাধাহীন!

পম্পেই নগরী প্রবল শক্তিমান আল্লাহর প্রতি কুফরি করল! তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে বড় ধরনের পাপ কাজে জড়াতে লাগল! অবাধ যৌনাচার এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গেল যে, রাস্তাঘাট, বিনোদনকেন্দ্র আর বাগানে সবাই সেগুলো করে বেড়াতে লাগল। তারা যেন প্রবল শক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি চাইতে লাগল, ফলাফল কী হলো?

একদিন! আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাইলেন, তিনি প্রবল শক্তিমান এবং কঠোর শাস্তিদাতা। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি এতই ক্ষমতাবান যে, তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীল কাজের মাধ্যমে যুদ্ধ করা বোকামি! তাদের দিকে শাস্তি ধেয়ে আসতে লাগল। ছোট ছোট ভূমিকম্প নাড়িয়ে দিতে লাগল শহরটাকে। পাপকাজে লিপ্ত সবার মুখের ওপর জানালাগুলো বন্ধ হতে লাগল!

হঠাৎ এক ক্রোধের দিনে শহরের খুব কাছ থেকে অগ্ন্যুৎপাত হলো। কালো ধোঁয়ায় পুরো আকাশ ছেয়ে গেল। সূর্যের রশ্মি পর্যন্ত ঢেকে ফেলল। দিনকে রাত বানিয়ে ফেলল। আরামকে শাস্তিতে রূপ দিলো!

পাপীরা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বিপদ দেখে জেগে উঠল। আল্লাহর শাস্তি থেকে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় পালাবে? ক্রোধের অগ্ন্যুৎপাত থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুন তাদের ওপর বর্ষিত হতে লাগল। ছাদগুলো বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল। বাড়িগুলো ভেঙে পড়ল। সুন্দর দিন আর সুখময় স্মৃতির অবসান ঘটল!

এই তো, পম্পেই আবার নতুন করে জেগে উঠছে! প্রায় ২ হাজার বছর মাটির নিচে থাকার পর। আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে ঐ মানুষগুলোর চেহারা, যারা কবিরা গুনাহ করে প্রবল শক্তিমানের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। যাদের বিবর্ণ চেহারায় আর্তনাদের ছাপ সুস্পষ্ট! অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে তাদের মরণের আগের শেষ ছবি এবং মুখাবয়ব সংরক্ষিত হয়েছে! আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যেন কখনো পাপে লিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে স্পর্ধা না দেখাই, তিনি যেন কখনো আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ না হন!

ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু

লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যখন তার অবাধ্যতা করল, আল্লাহ তাঁর একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিলেন। ফেরেশতা তাদের গ্রামটা আসমানের কাছাকাছি তুলে এনে তারপর সজোরে ডানা দিয়ে জমিনে ছুড়ে দিলো। লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ওপর এমন ভয়াবহ পরিণতি নেমে এসেছিল!

দুর্ভাগারা যখন আল্লাহর নবি নুহ আলাইহি সালামকে আক্রমণাত্মক কথা শুনিয়ে দিলো, তার দাওয়াতের বিপরীতে জিদ দেখাল, তখন তিনি হাত তুলে প্রবল শক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রবল শক্তিমান আল্লাহ আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলেন—

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বারসমূহ প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে।[১]

নুহ আলাইহিস সালামের দুআর কারণে তিনি পৃথিবী ডুবিয়ে দিলেন!

তাঁর শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই!

এক জাতির ওপর রেগে গেলেন, তো আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন!

আরেক জাতির ওপর রেগে গেলেন, এক প্রকাণ্ড চিৎকারে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন!

কিছু মিসকিন তাঁর ওপর বড়াই করতে গিয়েছিল, তাদেরকে ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে শেষ করে দিলেন!

এমন কোনো জালিম নেই, যার শেষ তাঁর হাতে নেই। এমন কোনো প্রতাপশালী নেই যাকে ভেঙেচুরে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই।

দুনিয়ার প্রতিটা অহংকারীকে তিনি মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করেই শেষ করে দিতে পারেন।

---

[১] সুরা কমার, আয়াত : ১১

আল-বাদি

আল্লাহ তাআলার কিছু নাম আছে যেগুলো অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হলেও পার্থক্য আছে। সে নামগুলোর মাঝে রয়েছে আল-খালিক তথা সৃষ্টিকর্তা, আল-বারী তথা উদ্ভাবনকারী, আল-মুসাউয়ির তথা রূপদাতা ও আল-বাদি তথা উদ্ভাবক।

আজকে আমাদের আলোচনা হবে এই সুন্দর নামগুলোর মাঝে চতুর্থ নামটি নিয়ে। অর্থাৎ আল-বাদি।

আরবিতে ইবদা বলতে সৃষ্টি করা বা অস্তিত্ব দেওয়া বোঝায় না। বরং এর অর্থ কোনো কিছুকে পূর্বের নজির ছাড়া সৃষ্টি করা। পরবর্তীকালে সেই অভিনব সৃষ্টি এত বেশি হয়ে যায় যে সেগুলো গণনা করা কিংবা সীমিত করার বিষয়টা কল্পনাও করা যায় না।

এই জগতে প্রতিটি জিনিসেরই অভিনবত্ব আছে। আমি 'প্রতিটি জিনিস' কথাটি আক্ষরিক অর্থেই বোঝাচ্ছি। প্রত্যেক বস্তুরই অভিনবত্ব আছে, অস্তিত্বের বিশেষত্ব আছে। এ অস্তিত্বের সামনে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়, তার চিন্তা দিশেহারা হয়ে পড়ে!

আমি আবারও বলছি 'প্রতিটি জিনিস'! আমি শুধু মানুষকে 'জিনিস' হিসেবে গণ্য করছি না। বরং আমি বোঝাচ্ছি মানুষের ভেতর যে কোষ, শিরা-উপশিরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে সবই! এমনকি কোষের গঠনও আসমান-জমিনের উদ্ভাবক আল্লাহর এক উদ্ভাবন! এই গ্যালাক্সির সমান কোনো বই লেখা হলেও সেটা আল্লাহর অভিনব সৃষ্টি ও রূপের বিবরণ দিয়ে শেষ করতে পারবে না!

আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়েই আমরা এই মহান নামের সাথে যাত্রা করব যাতে সৃষ্টিজগতে আল্লাহর অভিনব কিছু সৃষ্টি আরও স্পষ্ট জানতে পারি। ভাবনার জন্য আমাদের বুদ্ধি, দেখার জন্য আমাদের চোখ আর অনুভব করার জন্য আমাদের হাতের চাইতে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। জগৎ এমন এক পৃষ্ঠার মতো, যেটা আমাদেরকে মহান উদ্ভাবক সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য খুব গভীরে যেতে বলে না।

আওয়াজ : এক বিস্ময়

সৃষ্টিজগতে আল্লাহর অন্যতম উদ্ভাবন এবং অভিনব বিষয় হলো প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর আওয়াজের এই জগৎ।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে সবাই আওয়াজ অনুভব করে। আর সেটা বায়ুকম্পনের ফল। তার থেকেও অবাক করার মতো বিষয় হলো, মানুষ ও প্রাণীসহ আল্লাহ আরও যাদেরকে চান, তারা সবাই বায়ুর ঐ কম্পনকে অর্থপূর্ণ মনে করে থাকে!

আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির তিন মিনিট আগে কেমন ছিল কল্পনা করুন তো! কোনো মানুষের কথাবার্তা ছিল না। ভাবুন তো আল্লাহ কীভাবে জানলেন তিন মিনিট পরে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করছেন তাতে আওয়াজ নামের এক উদ্ভাবন না থাকলে কিছুই বোঝা যেত না! আর জানতেন বলেই তো আল্লাহ এমন অনন্য সুন্দর বৈচিত্র্যে ভরপুর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন!

তারপর আপনি বুলবুলির গান, ঘুঘুর তান, গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি, পানির কলকল ধ্বনি শুনতে পান! আরও কত সুন্দর, জীবন্ত আর চমৎকার জিনিস যে আপনি শুনতে পান! সুবহানাল্লাহ, আপনি কতই না মহান!

জীবনের সুর

সুরের বৈচিত্র্যও অভিনব!

আসুন কল্পনা করি সব মানুষের গলার স্বর একই রকম, সুরও এক ধরনের।

আপনাকে পাশের রুম থেকে কেউ ডাকল, আপনি বুঝতে পারবেন না, সে আপনার মা নাকি বাবা? নাকি আপনার ৭ বছরের সন্তান নাকি আপনার ৪০ বছরের ভাই?

আপনার গলার আওয়াজ বিক্রেতার আওয়াজের মতোই। হঠাৎ আরেকজন ক্রেতা ঢুকে একটা পণ্যের ব্যাপারে জানতে চাইল। সেও আপনার মতো আওয়াজে কথা বলল। বিক্রেতা আপনার মতো সুরে উত্তর দিলো। দূর থেকে দোকানের মালিকও

চিৎকার করল। একই সময়ে এক বাচ্চার মা দোকানের বাহির থেকে বাচ্চাকে ডাকল। বাচ্চা বিরক্তির সাথে জবাব দিলো। সব আওয়াজ একটা অন্যটার সাথে গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি বুঝতেই পারছেন না কে কথাটা বলছে।

জীবন তার গভীরতা হারিয়ে বসবে। আমরাও অনেকাংশে জীবনের বুঝ হারিয়ে ফেলব। আমাদের জীবনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। অনুভূতিগুলো এলোমেলো হয়ে যাবে। যে মানুষটা নতুন বিয়ে করল, তার স্ত্রীর গলার আওয়াজ যদি বন্ধুদের কিংবা মসজিদের ইমামের কিংবা গোত্রের প্রধানের কিংবা অফিসের প্রধানের মতো হয়, তাহলে স্ত্রীর গলা শুনে কি তার হৃদয়ে ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হবে? খুবই বিরক্তিকর পরিস্থিতি দেখা যাবে তখন। দম বন্ধ হয়ে আসার মতো।

প্রথম মানুষটা সৃষ্টি করার আগে স্রষ্টা এই সকল সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা জানতেন। তাই প্রত্যেকের গলায় এক বিশেষ সুর দিয়েছেন। এক ভিন্ন সুর দিয়েছেন। আলাদা ব্যক্তিত্ব প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে নারীর কণ্ঠ গভীর ও উষ্ণ হয়, আর পুরুষের কণ্ঠ শক্ত ও কর্কশ হয়। মায়ের কণ্ঠ তার হৃদয়ের মতোই দরদি হয়, আর শিশুর কণ্ঠ তার দুই চোখের দৃষ্টির মতোই নিষ্পাপ হয়!

আপনি আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারেন অমুকের ছেলে তমুক আপনাকে ডাকছে। হ্যাঁ, কারণ তার আওয়াজে এমন বিশেষত্ব রয়েছে যেটা তার পূর্ণ নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যেটা তার চেহারার আকৃতির সাথে মিলে যায়, যেটা তার প্রতি আপনার অনুভূতিকে তুলে ধরে।

গোপন, আর গোপনই থাকবে

আমরা যদি ১০০ জন মানুষের গলার ভেতরের ছবি এবং কণ্ঠনালীর গহ্বরগুলোর ছবি তুলি, তাহলে গঠনের দিক থেকে পার্থক্য খুঁজে বের করা খুব কঠিনই হবে। তাহলে কীভাবে আহমাদের গলার স্বর খালিদের গলার স্বর থেকে আলাদা হলো? খালিদেরটাই বা যিয়াদের চাইতে ভিন্ন হলো কী করে?

আমাদের গলার আওয়াজে বিশেষত্ব কীভাবে আসে? একই স্বরে কখনো রূঢ়তা, কখনো তীক্ষ্ণতা কীভাবে আসে? কীভাবে একই স্বর কখনো ভরাট হয় আবার কখনো মমতার প্রকাশ ঘটায়?

শুধু স্বরের তীক্ষ্ণতাই বিষয় না, আপনি বহু তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাবেন, কিন্তু প্রতিটা আওয়াজের মাঝে আবার ভিন্নতা পাবেন। আবার বহু ভরাট গলার আওয়াজ শুনতে পাবেন, কিন্তু প্রত্যেকটা আওয়াজের এমন জোর পাবেন, যেটা দিয়ে অন্য

আওয়াজ থেকে আলাদা করতে পারবেন।

ধ্বনিতত্ত্বে আওয়াজের স্তরের ক্ষেত্রে কিছু আওয়াজ পুরুষের আর কিছু আওয়াজ নারীর স্তরে। আপনি যত মানুষের স্বর শুনতে পান, সব এই স্তরগুলোর অধীন। উদাহরণস্বরূপ ব্যারিটোন এমন একটা স্তর, যার অধীনে আপনার পরিচিত বহু পুরুষের গলার স্বর থাকবে। এই স্তরের অধীন হবে বিভিন্ন আওয়াজের অধিকারী অগণিত কারি। একই কথা টেনর নামক স্তর এবং বাস নামক স্তরসহ অন্যান্য স্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মানুষের কণ্ঠে আল্লাহর যে অভিনব উদ্ভাবন, সেটা দেখে বিস্মিত হওয়ার জন্য খুব গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। শুধু আপনার গলার আওয়াজ আর আপনার সাথে বসবাস করে এমন একজনের গলার আওয়াজ মিলিয়ে দেখুন। তারপর প্রশ্ন করুন, কীভাবে আওয়াজ দুটি ভিন্ন হলো? অথচ এই আওয়াজ উৎপন্নকারী বাগযন্ত্র দুটি পূর্ণ বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল রাখে?

প্রসিদ্ধ কারি আব্দুল বাসিত আব্দুস সামাদের কেরাত শুনে দেখুন। কীভাবে তীক্ষ্ণ গলায় তিনি পড়েন, তারপর এমন এক সুর দেন যেটা অন্তর গলিয়ে দেয়! এর সাথে তুলনা করুন শুয়াইশিয়ের গলার স্বর! অথচ দুজনের আওয়াজ ধ্বনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই স্তরের!

আমাদের গলার আওয়াজগুলো জীবনের নানান রঙের মতো। আপনি যদি রং-বিহীন একটা জীবন কল্পনা করতে পারেন, তাহলে ধ্বনিগত তারতম্য ও বিশেষত্ব বিহীন একটা জীবন কল্পনা করতে পারবেন।

মোরগের ডাক!

গ্রামাঞ্চলে কুকুর ডাকে। উদ্ভাবক আল্লাহ তার জন্য ঘেউ ঘেউ আওয়াজ বাছাই করে দিলেন, অন্য কোনো আওয়াজ না। মোরগের জন্য তিনি দিয়েছেন ঘুম-ভাঙানো 'কুক্কুরুকু' ডাক; কারণ আল্লাহ জানেন মোরগের ডাক যদি কুকুরের আওয়াজের মতো হতো, তাহলে সকালটা জঘন্য হয়ে যেত!

বুলবুলি পাখি গাছের ডালে বসে বেদনাবিধুর শান্ত স্বরে গান গেয়ে যায়।

ঘোড়া চিহি ডাকে, ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করে, বিড়াল মিউ মিউ করে, নেকড়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

সব পশুর স্বর যদি এক রকম হতো, তাহলে আপনি নেকড়ের আওয়াজ পেলে

কীভাবে পালাতেন? কারণ মুরগি, বিড়াল আর বুলবুলি পাখি সবাই তখন একই আওয়াজ করবে।

আমরাই শুধু আওয়াজকে গুরুত্ব সহকারে দেখিনি। নাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে নাকি নেই সে ব্যাপারে যত উদ্ভট চিন্তাকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি, সেগুলো দূর করে দেওয়ার জন্য আওয়াজ নিয়ে ভাবাই যথেষ্ট হতো।

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ... ﴿١٠﴾...

আল্লাহর ব্যাপারে কোনো সংশয় আছে কি?[১]

মানুষের মনে এমন রবের ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আসতে পারে, যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণের ব্যাপারেও উদাসীন নন? তাই তো তিনি জীবিত প্রাণী তৈরি করেই ছেড়ে দেননি। বরং সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকের গলায় দিয়েছেন ভিন্ন স্বর। সেই স্বর বা আওয়াজ শোনামাত্র মানুষজন একটা অর্থ বুঝতে পারে।

দরজা বন্ধ করার আওয়াজ কখনো গ্লাস ভাঙার আওয়াজ কিংবা মানুষের হেঁটে চলার আওয়াজ কিংবা নদীর প্রবাহের আওয়াজের মতো নয়। প্রত্যেকটা জিনিসের শব্দ আছে। আর প্রতিটি শব্দের অর্থ আছে। প্রতিটি অর্থের এমন গভীরতা আছে, যা জীবনকে 'জীবনে' পরিণত করে। এই অর্থগুলো ছাড়া জীবন পরিণত হতো একাকিত্বের নিঃশব্দ এক কারাগারে।

চোখ

উদ্ভাবক আল্লাহর অন্যতম উদ্ভাবন হলো মানুষ তার সামনে দৃশ্য ও চিত্র দেখতে পারে! তার চারপাশে যা কিছু আছে দেখতে পায়। সে যদি এগুলো না দেখত, তাহলে তার জীবন হোঁচট খেত, জীবনের পথচলা থেমে যেত!

একবার আমি আমার ছাত্রদের সাথে কথা বলছিলাম আল্লাহর এমন কিছু নিয়ামতের বিষয়ে যেগুলো আমরা আর অনুভব করি না। তারপর আল্লাহ আমাকে একটা সহজ উপায় বাতলে দিলেন যেটার জন্য খুব বেশি কথাবার্তার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ছাত্রদের হৃদয়ে এর প্রভাব পড়ে। এক ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে তার চোখে কাপড় বেঁধে দিলাম। তারপর তাকে একটা সহজ কাজ করতে বললাম। টেবিলের ওপর থেকে

[১] সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ১০

একটা কলম নিয়ে অমুক ছাত্রকে দিতে। ক্লাসের আঙিনায় বিচরণ করতে গিয়ে তার কয়েক মিনিট লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে চোখের কাপড় খুলে দিতে বলল। খোলার পর সে দেখল সে কলম আর ছাত্র থেকে অনেক দূরে!

প্রথম জায়গায় ফিরে আসতে বললাম। এবার কাপড় না বেঁধে করতে বললাম। কয়েক সেকেন্ডে কাজটা সে সেরে ফেলল।

আমি ভাবলাম, আল্লাহ যদি আমাদেরকে অন্ধ করে সৃষ্টি করতেন, তাহলে আমাদের জীবন কেমন কঠিন হতো?

আমরা কীভাবে একে অন্যকে বুঝতাম? কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতাম? কীভাবে কিছু তৈরি করতাম, উৎপাদন করতাম, উন্নতি করতাম এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করতাম?

ইয়াম্বু শহরে একবার আমি মোবাইলের দোকান থেকে বের হচ্ছিলাম। গাড়িতে ওঠার আগে ৬০ বছরের এক অন্ধ লোককে ফুটপাতে দেখলাম। হাত দিয়ে সে অনুভব করে হেঁটে চলেছে। ফুটপাতটা বেশ উঁচু ছিল, আরেক পা এগুলেই সে নির্ঘাত নিচে পড়ে যেত!

শেষ মুহূর্তে তার নাগাল পেয়ে তাকে ধরে ফেললাম। গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে নিজের গাড়িতে ওঠালাম। গাড়িতে ওঠার পর সে আমাকে জানাল সে জন্মান্ধ। অর্থাৎ সারা জীবন সে কিছুই দেখেনি! একটা প্রশ্ন সবসময় আমার মাথায় ঘুরত, সেটা তাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম। 'আপনি কীভাবে রং চিনেন?' তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে বুঝেন কোন মানুষটা সুন্দর আর কোন মানুষটা কুৎসিত?'

তার উত্তর আমার ভেতরটা গুঁড়িয়ে দিলো। সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রের দৃশ্য, আকাশের স্বচ্ছতা, সকালের সূর্যোদয়, নানান রঙের জাদু—কোনো কিছুই জানে না।

নিজেকে প্রশ্ন করুন, কত বার একটা শিশুকে খেলতে কিংবা পাখিকে আকাশে উড়তে দেখেছেন? বিশাল আকৃতির মসজিদ বা সাদা সাদা মেঘ কবে থেকে দেখেছেন? তারপর ভাবুন এমন মানুষটার কথা, যার বয়স ষাট বা সত্তর বা আশি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও সে এগুলো এক মুহূর্তের জন্যও দেখতে পারেনি।

রং

আপনার দুচোখ আছে মানে আপনি রং দেখতে পাবেনই! এমন অনেক প্রাণী আছে, যেগুলো রং দেখতে পায় না। আপনি যা কিছু স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত দেখতে পান, তাদের দৃষ্টিতে এই সবই ধূসর!

বিভিন্ন প্রাণীর কথা বাদ দিই, কর্মক্ষেত্রে আমার এক বন্ধুর ব্যাপারেই বলি। আমরা ছাদের ওপর থেকে ঝুলে থাকা গাছের সবুজ কৃত্রিম কিছু পাতা নিয়ে কথা বলছিলাম। কথার মাঝখানে সে একটু সিরিয়াস হয়েই বলল, 'এই পাতাগুলোর রং কী?'

আমি মুচকি হেসে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু তাকে বেশ সিরিয়াস মনে হলো।

আমি বললাম, 'সবুজ! কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করছ কেন তুমি?'

সে বলল, 'আমি সবুজ রং দেখতে পাচ্ছি না। আমার কাছে এগুলো কফির রঙের মতো!'

আমি অবাক হয়ে ভ্রু-কুঞ্চিত করলাম। সে বলল, 'আমি বর্ণান্ধ। কোনো রং দেখতে পাই না।'

তারপর সে জানাতে লাগল যে সবুজ রং কী সেটা সে বোঝে না। যত কিছুকে সবুজ বলা হয়, সবগুলো সে কফির রঙের মতো দেখে। এমনকি ট্রাফিকের সিগনালও ধারাবাহিকভাবে সে মুখস্থ রাখে। নিচের আলোটা জ্বলে উঠলে সে বুঝতে পারে সবুজ বাতি জ্বলেছে।

তার কথা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। অনলাইনে বেশ কিছু ওয়েবসাইট আর ভিডিও দেখে রোগটা উদঘাটন করা শুরু করেছিলাম। সেদিনের আগ পর্যন্ত আমি কখনো এই রোগে আক্রান্তদের জীবন নিয়ে ভাবিনি!

আমি জানতে পারলাম এমন কিছু চশমা আবিষ্কার হয়েছে যেগুলো দিয়ে বর্ণান্ধরা স্বাভাবিক রংগুলো দেখতে পারে। কিছু ভিডিও দেখলাম, যেখানে বর্ণান্ধ মানুষগুলো চশমাটা পড়ে জীবনে প্রথম বারের মতো রং দেখছে। তারা যখন প্রথম বারের মতো বিশ্বের সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে, তখন মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে গাছ আমরা সবসময় দেখি, সেগুলো তারা প্রথম বারের মতো বাস্তব রূপে দেখতে পাচ্ছে!

বিস্তারিত আলাপ ছেড়ে আমার প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসুন, যদি জীবনে কোনো রং না থাকত, কেমন হতো এ জীবন? যদি আমরা রংগুলো আলাদা করতে না-ই পারতাম?

তাহলে আমরা হলুদ রঙের বিভিন্ন জিনিস দেখার পর মনের ভেতর যে আনন্দের অনুভূতি অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করে, সেটা কি অনুভব করতে পারতাম?

আমাকে সেই নীল জিনিসগুলোর কথা বলুন তো, যেগুলো দেখলে সুখানুভূতি তৈরি

হয়? যদি নীল রং শুষে নেওয়া হতো, তাহলে কি সেগুলো এমন আনন্দ দিত?

টকটকে লাল রং যদি মেটে রঙে রূপ নিত, তাহলে আমার হৃদয়ে তার প্রভাব কেমন হতো?

আপনার চারদিকে তাকান। এই বিশ্বজগৎ নানান রঙে সমৃদ্ধ একটি কৌটা। রঙের বিশেষত্ব না থাকলে বিশ্বটা অর্থহীন হয়ে পড়ত!

রং অনুভব করার সুযোগ না থাকলে আরও কোন কোন জরুরি জিনিস অকার্যকর হয়ে যেত, সেগুলো আপনাকে আমি বলব না। আমি শুধু আপনাকে বলব ঐ সুন্দর জিনিসগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে, যেগুলোর রং না থাকলে সৌন্দর্যও হারিয়ে যেত। তারপর এমন রবের কথা ভেবে মুগ্ধতা অনুভব করুন, যে রব আপনার জীবনে শুধু সিরিয়াস জিনিসপত্রই দেননি, বরং এমন অনেক কিছু দিয়েছেন যেগুলো আপনার জীবনকে রঙিন, সুন্দর ও উজ্জ্বল করে তুলবে।

এরপর আমার সাথেই প্রশ্ন তুলুন, কেন নাস্তিকরা জোর দিয়ে বলতে চায় আল্লাহর অস্তিত্ব নেই? আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাকে দেখার তীব্র আগ্রহের মতো সুন্দর একটা জিনিস হারানোর মাধ্যমে তারা যে কত সুখ আর প্রশান্তি হারিয়ে বসছে সেটা যদি তারা বুঝত!

গ্লাস

আওয়াজ আর ছবি বাদ দিন। তরল পদার্থেও আল্লাহর উদ্ভাবনের নমুনা স্পষ্ট। আমরা শুধু একটা উদাহরণ নিতে পারি।

আপনি যদি নীল রঙের কালির সাথে হলুদ রঙের কালি মেশান, তাহলে এগুলো থেকে সবুজ রং তৈরি হবে। কেউ যদি ভুল করে তাহলে এটা বলতে পারে যে কালির রং কালো কিংবা বেগুনী। কিন্তু কেউ ভুল করে এ কথা বলবে না যে এই দুই কালি মিলে আপেলের জুস তৈরি হবে।

তাহলে আমার সাথে কল্পনা করুন। আপনার হাতে একটা চামড়ার পাত্র আছে। এর ভেতর আছে গোবর আর রক্ত। ভালোভাবে পাত্রটার মুখ বন্ধ করলেন। তারপর আশেপাশের মানুষদের বললেন, 'আমি এই পাত্রে ফুটো করব, কী বের হতে পারো আপনারা অনুমান করুন তো।'

সবাই নিশ্চিত বলবে যে এখান থেকে রক্ত আর গোবর বের হবে। নিশ্চয় সেটার রং মেটে হবে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হবে। খেতেও বাজে লাগবে।

এটাই সবচেয়ে যৌক্তিক এবং সম্ভাব্য বিষয়। সবচেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ যাদের বিবেক-বুদ্ধি, তারাও এর বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারবে না।

পদার্থবিজ্ঞানও এমন মিশ্রণের বাহিরে কিছু নিয়ে আসতে পারবে না, যে মিশ্রণ বমির উদ্রেক করে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়নের স্রষ্টা এই মিশ্রণ দিয়ে কী করলেন? চলুন দেখে নিই।

উদ্ভাবক আল্লাহ তাআলা এই মিশ্রণ থেকে সবচেয়ে সুস্বাদু পানীয় উৎপাদন করেন। এই পানীয়ের রং খুবই চমৎকার। পানীয়টা আল্লাহর অন্যতম মুজিযা। আর এই মুজিযা হলো উপাদেয় খাঁটি দুধের মুজিযা!

আল্লাহ তাআলা দুধ তৈরির এক আশ্চর্যজনক বিবরণ ও চিত্রায়ণ তুলে ধরে বলেন—

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

> আর নিশ্চয় গবাদিপশুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দকর।[১]

এখন আপনি স্বীকার করে নেবেন যে, নীল আর হলুদ রঙের মিশ্রণ থেকে আপেলের জুস তৈরি হওয়া যতটা অসম্ভব, তার চাইতেও অনেক বেশি অসম্ভব হলো রক্ত আর গোবর মিশ্রণে সুস্বাদু এক গ্লাস দুধ তৈরি হওয়া। আল্লাহর এমন সব অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি দেখলে আপনি বিস্ময়ে বিমূঢ় না-হয়ে পারবেন না। আপনি বলতে বাধ্য হবেন 'সুবহানাল খালিক্বিল আযীম'। কতই না মহান ও পরাক্রমশালী আমাদের স্রষ্টা।

সুগন্ধ

গন্ধেও আছে অভিনবত্ব।

আপনার সামনে যদি আতরের একটা শিশি রাখা হয়, আপনি খুলে দেখেন, তাহলে আপনার সামনে সুগন্ধ বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এরপর যদি আপনাকে

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৬৬

জিজ্ঞেস করা হয়, এটা মেশ্‌ক। কোন ফুল থেকে তৈরি, কিংবা কোন উদ্ভিদ থেকে এটার জন্ম বলে মনে করেন?

আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বহু ফুল আর উদ্ভিদের নাম হাজির করবেন। কিন্তু যে জিনিসটা আপনি বলবেন না সেটা হলো, এটা মৃত প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা গ্রন্থির নাম!

অনেকে জানে না যে মেশ্‌ক এত সুন্দর গন্ধ দেয়, সেটা মূলত হরিণের নাভিমূল থেকে উদ্গত এক প্রকার গ্রন্থি!

আল্লাহ তাআলা এমন বিস্ময়কর জিনিস তৈরি করেন যাতে মানুষজন 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারে!

নাহলে হরিণের সাথে সুগন্ধির কী সম্পর্ক? কেন শুধু নর হরিণের নাভিতেই হয়, নারী হরিণের নাভিতে হয় না? কেন অনিন্দ্য সুন্দর একটা ফুলের থেকে এমন সুগন্ধি উৎপন্ন হয় না?

যে আল্লাহ মানুষ থেকে মানুষকে, ঘোড়া থেকে ঘোড়াকে আর পাখি থেকে পাখিকে সৃষ্টি করেন, তিনি এক চমকপ্রদ পন্থায় কিছু একটা সৃষ্টি করেন। সে পন্থা দেখে আমরা প্রাণ খুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে ফেলি, আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই আসমান-জমিনের উদ্ভাবক!

আম্বর

মেশকের শিশিটা এক পাশে রাখুন। আমার সাথে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিন। সেখানে কি কোনো সংঘাত আপনার চোখে পড়ে না? সজোরে ধেয়ে আসছে একটা তিমি মাছ। যাতে এক কামড়ে বহু মাছকে গিলে নিতে পারে। আর সেটা কোনো কিছুর পরোয়া না করে, নির্দয়ভাবে!

আমি যদি আপনাকে এখন প্রশ্ন করি, এই বিশাল প্রাণী থেকে কোন ধরনের প্রাণী জন্ম নিতে পারে? অথবা আমি যদি বলি, এই বৃহদাকৃতির জন্তু কী উৎপন্ন করতে পারে? নিশ্চয়ই ভয়াবহ এবং ঘৃণ্য কোনো কিছুই হবে!

কিন্তু যে উদ্ভাবক আল্লাহ তাআলা জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন, অসুন্দর থেকে সুন্দর উৎপন্ন করেন আর খসখসে জিনিস থেকে তুলতুলে জিনিস তৈরি করেন, তিনি এই ভয়াবহ তিমির পেট থেকে সুন্দর, চমৎকার, মহান ও শ্রেষ্ঠ আতর বের করে আনেন, যার নাম আম্বর।

আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে আম্বর এমন ইউনিক একটি আতর যা আম্বর নামক তিমির পেটের ভেতর থেকে বের করা হয়। এটা বিচিত্র রঙের।

আসুন আমরা আম্বরের ভেতরে ডুব দিয়ে আরও অভিনবত্ব দেখি। বাস্তবে এই আম্বর হলো গন্ধহীন সাদা কিছু স্ফটিক। এই স্ফটিকগুলো জারণ করার মাধ্যমে দুটি পদার্থে রূপ নিয়ে তীব্র সুগন্ধ প্রদান করে! সুতরাং এখানে গন্ধহীন বস্তু থেকে সুগন্ধ উৎপন্ন হয়! বিপরীত বস্তু থেকে এটা বস্তু সৃষ্টি হয়! একটা সৃষ্টিকে তার বিপরীত কিছু থেকে সৃষ্টি করা হয়!

এই বিশ্বজগতের উদ্ভাবক কতই না মহান, কতই না পবিত্র!

মুক্তো

আমরা যেহেতু সমুদ্রের গভীরে আছি, তাহলে মুক্তোর খোঁজে একটু সময় কাটাই। স্বচ্ছ সুন্দর স্ফটিকগুলোর দিকে তাকাই, যেগুলোর সৌন্দর্য আলো জ্বেলে চকচক করতে থাকে।

আমার চিন্তা বোঝার জন্য কিছুক্ষণ আপনি নিজের মাথা থেকে সব তথ্য মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি যদি মুক্তোর উৎস জেনেও থাকেন, তবু কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যান। তারপর আমাকে জানান এই সুন্দর মুক্তো উৎপন্ন করার জন্য উপযুক্ত সৃষ্টি কী হতে পারে?

আপনার পছন্দমতো প্রস্তাব দিন।

হয়তো আমাদের চোখে সেটা এমন প্রাণীই হবে, যেটা গোলাকৃতির, যার শরীর চকচক করে এবং বেশ শক্ত। অথবা নিদেনপক্ষে সুন্দর প্রাণী হবে। মুক্তোর সৌন্দর্য যেমন, তার উৎস তেমন সুন্দর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আচ্ছা, আপনি কি বাদামি রঙের ঝিনুক দেখেছেন? যেটা আকৃতি একদমই সুন্দর নয়? এটার শরীর খুলে ফেলুন।

এর ভেতরের আঁশ আর অসুন্দর চর্বিগুলো কি দেখেছেন?

আঙুল দিয়ে ভেতরটা ঘেঁটে দেখুন।

পেয়েছেন?

চকচক করছে... হ্যাঁ, এটাই মুক্তো!

এমন সুন্দর মুক্তো কীভাবে এই অদ্ভুত প্রাণীর শরীরে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারল?

আরও পেছনে যাই। দেখি আল্লাহ কীভাবে মুক্তো সৃষ্টি করলেন। বস্তুত এই মুক্তো একগুচ্ছ ধুলোবালি। এগুলো ঝিনুকের পেটে ঢুকে পড়েছে। তারপর ঝিনুকের শরীর থেকে নিঃসৃত লালার মিশ্রণ ঘটে ধীরে ধীরে এটাকে কেন্দ্র করে জমাট বাঁধতে থাকে। এই আবরণটা এক পর্যায়ে শক্ত হয়ে মুক্তায় রূপ নেয়, যেটা নারীদের অলংকার হিসেবে শোভা পায় গলায়। দেখুন কীভাবে উদ্ভাবক আল্লাহ তাআলা এই সামান্য লালার প্রাচীরকে এমন সুন্দর বস্তুতে রূপ দিলেন, যার সৌন্দর্য দেখে মানুষের হৃদয়গুলো বিস্মিত হয়ে যায়!

মুগ্ধতার ভিড়ে

এত বিস্ময় ও মুগ্ধতার মাঝে একটা দামি, সুন্দর এবং রঙিন পাথর দেখলে আপনি হতবাক হয়ে যেতে বাধ্য। সেটা হলো প্রবাল পাথর! এই পাথর মুকুটে বসানো হয়, সুন্দরীদের মালার ঠিক মাঝখানে থাকে!

আপনি স্রষ্টার উদ্ভাবনে বেশি মুগ্ধ হবেন যখন জানতে পারবেন এই প্রবাল মূলত সামুদ্রিক উদ্ভিদ, যার সাথে কোনো পাথর বা খনিজ পদার্থের সম্পর্ক নেই!

যে স্বাদু পানি আমরা আনন্দ নিয়ে পান করি, যেটা দিয়ে খাবার তৈরি করি, যেটা দিয়ে আমাদের ভেতর জ্বলে ওঠা আগুন নিভিয়ে ফেলি, সেটা মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। একটা হলো হাইড্রোজেন (যেটা জ্বলে) আর অন্যটা হলো অক্সিজেন (যেটা জ্বলতে সাহায্য করে)!

আরও একটু গভীরে যাই। যে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অন্য মানুষের হৃদয় কেঁপে ওঠে বা আত্মা প্রভাবিত হয়, সেটা মূলত মুখের গহ্বরের কিছু মাংসপিণ্ডের নড়াচড়ার ফসল। তাহলে এই নিছক অবস্তুগত (আওয়াজ) জিনিসটা কীভাবে এমন বস্তুগত জিনিস থেকে সৃষ্টি হলো?

বরং আমাদের কথাবার্তা, বক্তৃতা, কবিতা, কথোপকথন—সবই বর্ণের সমষ্টি। আর এই বর্ণগুলো মুখের ভেতর জিহ্বার নড়াচড়ার ফল!

চোখ মেলে তাকান। বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ভাবুন। চারদিকে দৃষ্টিপাত করুন। বহু বিস্ময়কর সৃষ্টি আছে। অভিনবত্বেরও নানারকম উপাদান আছে। সবগুলো আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে যেন বলছে, সুউচ্চ আসমানের ওপরে এমন একজন রব আছেন, যিনি ইবাদতের উপযুক্ত।

তোমাদের নিজেদের মাঝেই

মানুষের শরীরটা মুজিযা আর বিস্ময়ের একটা জগৎ। প্রতিটি অংশে অগণিত জিনিস রয়েছে যার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারও আগে এই মহান রবের প্রতি গভীর ঈমান আনা জরুরি হয়।

আমাদের রব সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং এর সৌন্দর্যকে ভাবনা-চিন্তার টেবিলে রাখতে নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন—

وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

আর তোমাদের মাঝেই (নিদর্শন আছে), তবে কি তোমরা দেখো না?[১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা অভিনব পন্থায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন—

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ... ﴿٥٣﴾

আমি অবশ্যই আমাদের নিদর্শনসমূহ দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝে দেখিয়ে দেবো।[২]

আল্লাহ তাআলা এমন কিছু মানসিকতার লোকজনের উদ্দেশে কথাগুলো বলেছেন, যাদের কাছে নিদর্শনের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি হয়ে গিয়েছে। সেটা হলো একজন নবির সাথে তার সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্ক হবে। আল্লাহ তখন মুজিযা দিয়ে ঐ নবিকে সাহায্য করবেন। ফলে আল্লাহ যার জন্য ঈমান চেয়েছেন, সে ঈমান আনবে। যেমন, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করা, চাঁদ বিভাজন করা, সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মতো উট দেওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু এই আয়াতটা প্রচলিত ধারণা ও সংস্কৃতির বিপরীতে গিয়েছে। অর্থাৎ এমন কিছু নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তোমরা নিজেদের মাঝেই দেখতে পাবে। আল্লাহ

[১] সুরা যারিআত, আয়াত : ২১
[২] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৫৩

এতই মহান যে তিনি মুজিযার মঞ্চ তোমার ভেতরে স্থাপন করবেন। তুমিই হবে জগতের বিস্ময়কর নিদর্শন। তুমি সামনে যা দেখতে পাচ্ছ, সেটাই শুধু মুজিযা নয়। বরং তোমার ভেতরেই থাকবে এই অনুভূতি। হৃৎস্পন্দনে তুমি সেটা অনুভব করবে। তোমার অস্তিত্বের মুজিযা সমুদ্র-বিভাজনের মুজিযা থেকে কম কিছু নয়। তোমার শিরা-উপশিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিযা থেকে কম বিস্ময়কর নয়!

সূর্য

সূর্যের অস্তিত্ব না থাকলে কী হতো?

কুরআন কারিম এই প্রশ্নটা করছে যাতে করে মানুষও নিজের ভাষায় প্রশ্নটা সাজাতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

> বলুন, আমাকে জানাও, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?[১]

আমার মনে পড়ে *নিউক্লিয়ার উইন্টার* নামে একটা বই অনেক আগে পড়েছিলাম। সেখানে আলোচনা করা হয়েছিল যে, যদি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মাঝে একটা পরমাণু যুদ্ধ হয়, তাহলে কী কী ট্রাজেডি ঘটতে পারে। কীভাবে কয়েক বছরের জন্য আসমানজুড়ে শুধু ঝুল আর ময়লা জমে যাবে। আর সেটা ভেদ করে সূর্যের আলো আমাদের এই পৃথিবীতে পৌঁছতে পারবে না। ফলে এত এত করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

আমার সাথে কল্পনা করুন সূর্যের আলো আপনার কাছে পৌঁছতে বড় আকৃতির মেঘ বা আস্তরণ বাধা দিচ্ছে এমন নয় বরং সূর্যটাই নেই!

কী হবে তাহলে?

---

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ৭১

পুরো জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাদের পৃথিবীকে যে সূর্য আলোকিত করে, সেটার অস্তিত্ব নেই। সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটে যে চাঁদ আর নক্ষত্রের মাঝে, সেগুলোও নেই। সুতরাং পুরো জগতের আলো নিভে যাবে।

আপনি বলবেন, সমস্যা নেই। মানুষ বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করবে, যেমনটা করেছে এডিসন।

উত্তর দেওয়ার আগে আমি প্রশ্ন করব, এডিসনকে আল্লাহ সৃষ্টি করার আগে যত মানুষ অন্ধকারে ছিল, তারা কী করত?

তারপর আমাকে বলুন তো, আদি যুগের মানুষ তার চারপাশের সৃষ্টিকে দেখেই কীভাবে একটা বাতি তৈরি করত? কীভাবে বুঝত এটা কাচ আর ঐটা লোহা? এটা সুতা আর ঐটা তেল?

মানুষ যদি দেখতেই না পেত, তাহলে কীভাবে লোহা, কাচ, কটন কিংবা অন্য কিছু চিনত? বাতি তৈরির জন্য কাচ আর লোহার খোঁজে সমুদ্র, পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আর অভিযান চালানোর কাজে শুধু স্পর্শের অনুভূতি কি যথেষ্ট হতো?

তারপর যদি আমরা ধরে নিই, সে আলোর একটা বিকল্প কোনোভাবে তৈরি করে নিল, তাহলে সে খাবার পেত কোত্থেকে?

সমস্ত উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল। সূর্যের আলো উদ্ভিদের খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। তাহলে কীভাবে পৃথিবীতে টমেটো, পেঁয়াজ, গম, যব, আপেল আর কমলা জন্ম নিত?

আপনি কী মনে করেন? মানুষ কি শুধু গবাদি পশুর মাংস খেয়ে বাঁচতে পারত?

উদ্ভিদ এই প্রাণীগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার। তাহলে মেষ, ঘোড়া, উট বা অন্যান্য প্রাণী উদ্ভিদ ছাড়া বেঁচে থাকত কীভাবে?

তারপর আমার সাথে জগতের তাপমাত্রা কল্পনা করুন তো। শূন্য ডিগ্রির একশ সেলসিয়াস নিচে তাপমাত্রা! কারণ জগতের তাপের উৎসই তো সূর্য! সূর্য ছাড়া পুরো পৃথিবী শীতে জমে যাবে। সমুদ্র, মহাসাগর, নদী—সব জমে যাবে। বাড়িয়ে বলছি না মোটেও, পুরো জগৎটাই তখন একটা বড় ফ্রিজে পরিণত হবে!

কোনো এক সকালে সূর্য নিয়ে মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখেছেন কি? প্রতিদিন নিঃশব্দে কোনো শোরগোল না করে কীভাবে এটা ওঠে? আপনাকে যে এত

সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, সেগুলোর জন্য একটা টাকাও চায় না! সূর্যের এত নানামুখী উপকারিতা ভোগের জন্য আপনাকে আলাদা কিছু ব্যয় করতে হয় না। আপনি কি একবারও আসমান-জমিনের উদ্ভাবকের কৃতজ্ঞতা পোষণ করার কথা চিন্তা করেছেন?

অক্সিজেন

অক্সিজেন ছাড়া জীবন কল্পনা করাও কঠিন! সূর্য ছাড়া বেঁচে থাকা যদি অসম্ভব হয়, অক্সিজেন ছাড়া অস্তিত্বই অসম্ভব!

শরীরের কোষগুলো সচল থাকার জন্য অক্সিজেন দরকার।

মানুষের শরীরের চর্বি ও শর্করার ক্যালোরিতে রূপ নেওয়ার মাধ্যমে শরীরকে প্রাণবন্ত ও শক্তিমান করে তুলতে হলে অক্সিজেন লাগবেই লাগবে।

যে নিঃশ্বাস ছাড়া এক মিনিটেরও কম সময় থাকলে মানুষের জীবন চলে যাবে, সেটাও পুরোপুরি অক্সিজেন-নির্ভর।

বরং যে পানি জীবন বাঁচানোর প্রধান উপাদান, সেটাও গড়ে ওঠে দুটি হাইড্রোজেন আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে।

আপনি এখন প্রশ্ন করতে পারেন, অক্সিজেন, সূর্য, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, রং, সুগন্ধিসহ এই সবকিছু আগে কোন সৃষ্টির মাঝে ছিল? যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে নতুন প্রাণীগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্রমে উন্নত করা হয়েছে?

এখানে এসে আপনি বুঝতে পারবেন আল-বাদি তথা উদ্ভাবক শব্দের অর্থ। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিখুঁতভাবে উদ্ভাবন করেছেন। আপনি সারাজীবন তাঁর সিজদায় পড়ে থাকলেও তাঁর উদ্ভাবিত ও প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের একটা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন না। এই নিয়ামতগুলোর একটাও আপনি তার থেকে চেয়ে নেননি, এমনকি জানতেনও না যে, এগুলো আপনার কতটা প্রয়োজন; তবু তিনি আপনাকে দান করেছেন।

উপসংহার

আল্লাহর এই সুন্দরতম নাম ও উচ্চতম গুণাবলির পাশাপাশি এই মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার মাঝে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে আমি চেষ্টা করেছি সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছাতে, যে পাঠক বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর খুব গভীরে যায় না। বরং সাহিত্যিক ঢং, হৃদয়স্পর্শী ঘটনা আর শান্ত ভাষায় প্রদত্ত উপদেশ শুনে থাকে।

এই ভ্রমণ শেষে আমি আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে দুআ করছি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমি যেন এই নামগুলোর ছায়া থেকে আল্লাহর কিছু পরিচিতি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে সমর্থ হই। আমি যেন নামগুলোর অর্থ পাঠকের হৃদয়ে নাড়িয়ে দিতে পারি। এই নামগুলোর মাধ্যমে তাঁর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতাকে চিত্রিত করতে পারি। আমার ভাঙা কলম আর ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা।

আল্লাহ! আমি আপনার ব্যাপারে লিখেছি বটে, কিন্তু আমার অবস্থা কেমন তা আপনি জানেন। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করুন। আমার নিয়তটা কেবল আপনার জন্য একনিষ্ঠ করে দিন। আমার এই কাজটা এমন করে দিন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। আর উত্তমরূপে কবুল করে নিন। কাজটির মাধ্যমে আমাকে সেদিন সুখী আর সৌভাগ্যবান করুন, যেদিন আপনার সাক্ষাৎ পাব।

সালাত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবির ওপর।

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাঝেই লুকিয়ে আছে তাঁর পরিচয়ের গভীর মহিমা। রহমান, রহিম, রাজ্জাক—আল্লাহর এসব নাম শুধু নিছক নামই নয়, তাঁর অশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি নামের নিগূঢ় অর্থ আপনাকে বুঝিয়ে দেবে—কেন তিনি আমাদের রব! কেন আমরা তাঁর ইবাদত করব! কেনই-বা গর্ববোধ করব তাঁর বান্দা হিসেবে পরিচয় দিতে!

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর এমন অসাধারণ ব্যাপ্তি ও ব্যাখ্যা নিয়েই রচিত হয়েছে সমকালীন প্রকাশনের 'তিনিই আমার রব' নামের অনন্য সিরিজটি।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৪০৯-৮০০৯০০